বন্দী-জীবন

বন্দী-জীবন

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

প্রাচী পুস্তক প্রতিষ্ঠান
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

জন্মভূমির স্বাধীনতার আকাঙ্খা নিয়ে
রুদ্ধকারার অন্তরালে
যাঁরা শান্ত চিত্তে আত্মাহুতি দিয়েছেন
সেই সব
খ্যাত ও অখ্যাত মাতৃ-পূজারীদের উদ্দেশ্যে—

"—জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটাই মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী, এবং আমার বিশ্বাস এ কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। একথা আমাকে বলতেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারাশাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারাসংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে।"

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সূচী ঃ

শ্রীঅরবিন্দের—

কারাকাহিনী

উনিশশো-আট সালে মজঃফরপুরে বোমা ছুড়বার অপরাধে ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার হলেন, সেই সম্পর্কে পুলিশ কলিকাতায় মুরারীপুকুরের বাগানে বোমার কারখানা আবিষ্কার করলো এবং গ্রেপ্তার করলো বহুজনকে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত বাড়ী খানাতল্লাসী করে পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে লালবাজারে নিয়ে এল। চারদিন লালবাজারে হাজতে থাকার পর পঞ্চম দিনে তাঁকে নিয়ে আসা হলো আলিপুরে।

নির্জন করাবাস। ন' ফুট লম্বা পাঁচ-ছ ফুট চওড়া একখানি ঘর। জানালা নেই, সাম্‌নে লোহার গরাদ। ঘরের বহিরে একটি ছোট উঠান, পাথর দিয়ে বাঁধানো, তারপরেই উঁচু দেয়াল, সামনে কাঠের দরজা। সেই দরজার গায় গোল ছিদ্র করা আছে, বন্ধ দরজার ওদিক থেকে সেই ছিদ্রপথে চোখ লাগিয়ে শান্ত্রীরা সময় অসময় দেখে কয়েদী কি করছে। এই ধরণের নির্জন ঘর পাশাপাশি ছয়টি ছিল, সেই জন্য এইগুলির নাম ছিল ছয় ডিগ্রী। 'ডিগ্রী' অর্থ বিশেষ-সাজার ঘর—বিচারপতি বা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের হুকুমে যাদের নির্জন কারাবাসের দণ্ড নির্ধারিত হয় তাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে থাকতে হয়।

এই নির্জন কারাবাসে শ্রীঅরবিন্দের সম্বল ছিল দু'খানি কম্বল, একখানি

থালা ও একটি বাটি। এই থালা বাটির ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন ঃ "উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার সর্বস্ব-স্বরূপ থালা বাটির এমন রূপার ন্যায় চাকচিক্য হইত যে প্রাণ জুড়াইয়া যাইত।....দোষের মধ্যে থালায় একটু জোরে আঙ্গুল দিলেই তাহা আরবীস্থানের ঘূর্ণ্যমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতে থাকিত, এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা ধরিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেৎ ঘুরপাক খাইতে খাইতে জেলের অতুলনীয় মুষ্ট্যান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। থালা হইতে বাটীটিই আরও প্রিয় ও উপকারী জিনিষ ছিল।....বাটির জাত নাই। কারাগারে যাইয়া সেই বাটিতে জল নিয়া শৌচক্রিয়া করিলাম, সেই বাটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান করিলাম, অল্পক্ষণ পরে আহার করিতে হইল, সেই বাটিতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাটিতেই জলপান করিলাম এবং আচমন করিলাম। এমন সর্বকার্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের জেলেই পাওয়া সম্ভব!"

আরেকটি জিনিষ ছিল—জল রাখার একটি টিনের বালতী। বালতীটি উঠানেই থাকতো, সেখানেই শ্রীঅরবিন্দ স্নান করতেন। গোড়ার দিকে তাঁর কোন জলকষ্ট ছিল না, পরে জলকষ্ট দেখা দেয়। অধিকাংশ আসামীর ভাগ্যেই এই এক বালতী জলে শৌচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্নান সারতে হোত।

পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন ঃ "তখন গ্রীষ্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে বাতাসের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রৌদ্র অবাধে প্রবেশ করিত। ঘরটি উত্তপ্ত উনুনের মত হইয়া উঠিত। এই উনুনে সিদ্ধ হইতে অদম্য জলতৃষ্ণা লাঘব করিবার উপায় ঐ টিনের বালতীর অর্ধ-উষ্ণ জল। বারবার তাহা পান করিতাম, তৃষ্ণা ত যাইতই না বরং স্বেদ নির্গমন এবং অল্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্ণাই লাভ হইত।

"ওই তপ্ত গৃহে আবার জেলে তৈয়ারী করা দুইটি মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা। বালিস নাই, কাজেই একটি কম্বল পাতিয়া আরেকটি কম্বল পাট

করিয়া বালিস বানাইয়া শুইতাম। যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটিতে গড়াইয়া শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ করিতাম।....যেদিন বৃষ্টি হইত সেদিন বড় আনন্দের দিন হইত। ইহাতেও একটি এই অসুবিধা ছিল যে ঝড় বৃষ্টি হইলেই ধূলা, পাতা ও তৃণসঙ্কুল প্রভঞ্জনের তাণ্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট-খাট একটি জলপ্লাবন হইত। তাহার পরে রাত্রিতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না।" তারপর সেই জলপ্লাবিত মাটি যতক্ষন না শুকাতো ততক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের আর কোন উপায় থাকতো না।

তারপর জেলের আহারের কথা। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না।....মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙ্কর, পোকা, চুল, ময়লা ইত্যাদি কত প্রকার মশলা দেওয়া, স্বাদহীন ডালে জলের ভাগ অধিক, তরকারীর মধ্যে ঘাস পাতা শুদ্ধ শাক।....এই শাকের বিমর্ষ গাঢ় কৃষ্ণ মূর্তি দেখিয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভক্তিপূর্ণ নমস্কার করিয়া বর্জন করিলাম।

"সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারী জোটে এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে, তাহা অনন্তকাল চলিতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস যায়, কিন্তু দু'বেলা শাকের তরকারী, ঐ ডাল, ঐ ভাত। জিনিষটা বদলানো দূরের কথা, চেহারারও লেশমাত্র পরিবর্তন হয় না!

"জেলের আর একটি সুখাদ্য হচ্ছে 'লফ্সী'। লফ্সীর অর্থ ফেনের সহিত সিদ্ধ ভাত। ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফ্সীর ত্রিমূর্তি বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফ্সীর প্রাজ্ঞভাব, অমিশ্রিত মূলপদার্থ, শুদ্ধ শিব শুভ্রমূর্তি। দ্বিতীয় দিন লফ্সী হিরণ্য-গর্ভ, ডালে সিদ্ধ খিচুড়ী নামে অভিহিত, পীতবর্ণ, নানা ধর্মসঙ্কুল। তৃতীয় দিন লফ্সীর বিরাট মূর্তি, অল্প গুড়ে মিশ্রিত, ধূসর বর্ণ,

কিয়ৎ পরিমাণে মানুষের ব্যবহারযোগ্য।" এই তৃতীয় রকমের লফ্‌সীটাই শ্রীঅরবিন্দ মাঝে মাঝে দু-এক চুমুক খেতেন, তাও অনেক চেষ্টা করে। কারণ এই লফ্‌সীটাই বাঙ্গালী কয়েদীদের জেলখানার একমাত্র পুষ্টিকর আহার।

জেলে কয়েদীদের ভালো করে ঘুমোবারও উপায় নেই। "নিয়ম আছে যে যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে ডাক-হাঁক করিয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়িতে নাই।" অরবিন্দ বাবুকে রাত্রে যখন-তখন ঘুম ভাঙিয়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করতো—'বাবু ভাল আছেন তো?' প্রথমে কয়েকদিন অরবিন্দ বাবু মুখ বুঁজে সহেছিলেন, শেষে আর পারলেন না, ধমক দিতে সুরু করলেন! দু'চার দিন ধমক খাবার পর প্রহরীদের এই উত্যক্ত করার আকাঙ্খা কমে গেল। শ্রীঅরবিন্দও নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে বাঁচলেন।

জেলখানার নির্জনতা শ্রীঅরবিন্দকে সময় সময় অন্যমনস্ক করে তুলতো, কম্বলের উপর বসে বসে তিনি বাইরের পানে তাকিয়ে থাকতেন। লালবাজারের হাজতের চেয়ে অলিপুরের জেলখানা তাঁর কাছে সহজ হয়ে উঠেছিল। লালবাজারে প্রকাণ্ড ঘরের নির্জনতা যেন তাঁর বুকের উপর চেপে বসতো। সেখানে দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশও দেখা যেত না। বাইরের যে জগৎ আছে,—গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী, বাড়ীঘর আছে তা কল্পনা করাও অনেক সময় কষ্টকর হয়ে উঠতো। তার চেয়ে আলিপুর অনেক ভাল। ছোট ঘরখানির দেয়াল একান্ত পাশাপাশি সঙ্গী বলে মনে হয়। উঠানের দরজা খোলা থাকে, গরাদের পাশে বসে বাইরের পানে দৃষ্টি মেলে দেন। অন্যান্য কয়েদীকে চলাফেরা করতে দেখতে পান, চোখে পড়ে পাশের গোয়াল থেকে কয়েদীরা গরু চরাতে নিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে। দেখতে দেখতে দেখার নেশা জাগে, সবাইকার উপর জেগে উঠে একটা ভালবাসা। দেয়ালের ওপাশের গাছটির শ্যামল সুষমার পানে তাকিয়ে মন স্নিগ্ধ হয়ে উঠতো। আকাশের একটা টুকরো দৃষ্টিকে অনন্তের সন্ধান দিত।

কিন্তু দিনের পর দিন এই ভাবে কাটিয়ে দেওয়া নেহাৎ সহজ নয়। "সেই একমাত্র বৃক্ষ, নীল আকাশের পরিমিত খণ্ডটুকু এবং সেই জেলের নিরানন্দ দৃশ্যে কতক্ষণ মানুষের মন সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে? দেওয়ালের দিকে চাহিলাম। জেলের ঘরের সেই নির্জীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও নিরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যন্ত্রণাই উপলব্ধি করিয়া....ছটফট করিতে লাগিল। আবার ধ্যানে বসিলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না বরং সেই তীব্র-বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকর্মণ্য ও দগ্ধ হইতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, শেষে মাটিতে কয়েকটি বড় বড় কাল পিপীলিকা গর্তের নিকট বেড়াইতেছে দেখিলাম, তাহাদের গতিবিধি ও চেষ্টা-চরিত্র নিরীক্ষণ করিতে সময় কাটিয়া গেল। তাহার পরে দেখিলাম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল পিপীলিকা বেড়াইতেছে। কালতে লালেতে বড় ঝগড়া, কালগুলি লালকে পাইয়া দংশন করিতে করিতে প্রাণবধ করিতে লাগিল। অত্যাচার পীড়িত লাল পিপীলিকার উপর বড় দয়া ও সহানুভূতি হইল। আমি কালগুলিকে তাড়াইয়া তাহাদের বাঁচাইতে লাগিলাম। ইহাতে একটি কার্য জুটিল, চিন্তার বিষয়ও পাওয়া গেল, পিপীলিকাগুলির সাহায্যে এই কয়েকটা দিন কাটান গেল। তথাপি দীর্ঘ দিনার্ধ যাপন করিবার উপায় আর জুটিতেছিল না। মনকে বুঝাইয়া দিলাম, জোর করিয়া চিন্তা আনিলাম কিন্তু দিন দিন মন বিদ্রোহী হইতে লাগিল, হাহাকার করিতে লাগিল।"

মাঝে মাঝে তাঁর মনে হোত চিন্তার সূত্র হারিয়ে যাচ্ছে, মনে হোত তিনি পাগল হয়ে যাবেন, তখন প্রাণপণে ভগবানকে ডাকতেন।

জেলের ডাক্তার 'ডেলী' সাহেবের চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ সকালে বিকালে কিছুক্ষণ বেড়াবার অনুমতি পেয়ে ছিলেন। ডিগ্রীর সামনে স্বল্পপরিসর স্থান—একদিকে জেলের কারখানা, আরেকদিকে গোয়ালঘর। তিনি সেইখানেই সকালে বিকালে পদচারনা করতেন—সকালে এক ঘণ্টা, কখনো কখনো দু'

ঘণ্টা, আর বিকালে দশ মিনিট, কখনও-বা কুড়ি মিনিট। পদচারনা করতেন, আর মনে মনে উপনিষদের মন্ত্র আবৃত্তি করতেন, উপলব্ধি করার চেষ্টা করতেন উপনিষদের বাণী—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।'

এই আত্মময় নির্জনতার মাঝে একদিন ছেদ পড়লো। 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদকের কাছ থেকে এসে পড়লো গীতা ও উপনিষদ। সমস্ত দুপুরটা কাটতে লাগলো আদালতের নীরস মোকদ্দমার মাঝে। কিছুদিন পরে সমস্ত বোমার আসামীকে একত্র রাখার ব্যবস্থা হোল। "সকলেই অনন্দে অধীর হইলেন। সেই রাত্রিতে যে ঘরে হেমচন্দ্র দাস, শচীন্দ্র সেন ইত্যাদি গায়ক ছিলেন সেই ঘর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল। অধিকাংশ আসামী সেইখানে একত্র হইয়াছিলেন, এবং দুটো তিনটা রাত্রি পর্যন্ত কেহ ঘুমাইতে পারেন নাই। সারারাত হাসির রোল, গানের অবিরাম স্রোত, এতদিনের রুদ্ধ গল্প বর্ষাকালের বন্যার মত বহিতে থাকায় নীরব কারাগার কোলাহলে ধ্বনিত হইল। আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম, কিন্তু যতবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ততবারই শুনিলাম সেই হাসি, সেই গান, সেই গল্প সমান বেগে চলিতেছে। শেষ রাত্রে সেই স্রোত ক্ষীণ হইয়া গেল, গায়কেরাও ঘুমাইয়া পড়িলেন, আমাদের ওয়ার্ড নীরব হইল।"

পূরা একটি বছর [৫ই মে ১৯০৮ থেকে ৬ই মে ১৯০৯ সাল] হাজতবাস করে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পান।

শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন—"জেলে চোর-ডাকাত সাধু-সন্ন্যাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধ্রাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্ব-নাশের উপায় মাত্র। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়াচুরি করে।"

কিন্তু জেলে যে সব সময় অপরাধীরাই যায় তা নয়। আইনের ফাঁকে কত নিরপরাধ ব্যক্তিও দীর্ঘদিন কারাবাস করতে বাধ্য হয়। এই সম্পর্কে তিনটি

লোকের কথা শ্রীঅরবিন্দের মনে স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম হচ্ছেন "এ ব্যক্তি ডাকাতিতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম করাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্য-শিক্ষাসুলভ ধৈর্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্বদা প্রশান্ত সরল মৈত্রী ভাব বিরাজিত, মুখে সর্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ।....বৃদ্ধের যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্য নহে, পরের সুখ-সুবিধা সংক্রান্ত।....পরসেবা তাঁর স্বভাবধর্ম।....দেশের প্রতিও ইহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল! এই বৃদ্ধ কয়েদীর দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যমূর্তি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে।"

অপর দু'জন হচ্ছেন হ্যারিসন রোডের দুই কবিরাজ ভাই....নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। বিনা দোষে তাঁদের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। "নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর ও বুদ্ধিমান। হরি-কথা ও ধর্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন।....নগেন্দ্র ভগবদ্‌গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়া ছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহা বর্ণনা করিতেন।....ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান নন,....তিনি সর্বদা মাতৃ-ধ্যানে বিভোর। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারারুদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখ-দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"

কারাগার মানব সভ্যতার এক প্রাচীন প্রকাশ। একদিকে মানুষ সাহিত্য দর্শনের ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার আকাঙ্খায় যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, আরেকদিকে জড়বাদী মানুষ নিজ স্বার্থহানির শঙ্কায় রচনা করেছে

কারাগার। স্বার্থ ও স্বাধীনতা নিয়ে এই জুয়াখেলা চলছে। "ইহাতে কত দোষী বাঁচে, কত নির্দোষী মরে, তাহার ইয়ত্তা নাই। য়ুরোপে কেন সোশ্যালিজম্ ও এনার্কিজম্-এর এত প্রচার ও প্রভাব হইয়াছে, এই জুয়াখেলার মধ্যে একবার আসিলে, এই নিষ্ঠুর নির্বিচার সমাজরক্ষক পেষণযন্ত্রের মধ্যে একবার পড়িলে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়। এমত অবস্থায় ইহা আশ্চর্যের কথা নহে, যে অনেক উদারচেতা দয়ালু লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—এই সমাজ ভাঙ্গিয়া দাও, চূরমার কর; এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দোষীর তপ্ত নিঃশ্বাসে ও হৃদয়ের শোণিতে যদি সমাজ রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা রক্ষা করা নিস্প্রয়োজন।"

বারীন্দ্রকুমার ঘোষের—
দ্বীপান্তরের কথা

বোমার মামলার আসামী হিসাবে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে দ্বীপান্তরে যেতে হয়েছিল, সাথে ছিলেন আরো ছ'জন সহকর্মী : উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়, বিভূতিভূষণ সরকার ও অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। আন্দামানে তখনকার কয়েদীদের জীবনযাত্রার চিত্র তিনি দিয়েছেন তাঁর আত্মজীবনীতে :

"মহারাজা জাহাজ কয়েদী আনতে প্রতি চল্লিশ দিনে একবার করে কলিকাতায় যায়।....কয়েদী চালান এলে প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্লেগ-টাউনে ....দুই সপ্তাহ আটক রাখবার ব্যবস্থা ছিল।....ষোল দিনের দিন....এই নূতন দলকে প্লেগ-ক্যাম্প্ থেকে আনা হয় জেলে। তারপর পায়ের বেড়ী কেটে, পোষাক বদ্‌লানোর ব্যবস্থা! ডাক্তার এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বলে কার কেমন শক্তি-সামর্থ্য, জেলের কর্তা সেই অনুযায়ী এক একজনকে কাজ দেয়। —ছিল্‌কা কুটো, কলু পিষো, সাব্বল চালাও, রস্‌সি বাটো, ইত্যাদি। ছ'মাস বা এক বছর জেলের মধ্যে এইভাবে কাজ করার পর, কয়েদীরা জেলের বাহিরে কাজ করার অনুমতি পায়। সারা দ্বীপটি জুড়ে অনেকগুলি টাপু বা ষ্টেশন আছে, সেখানে কয়েদীদের রাস্তাঘাট তৈরী করতে হয়, জেটিতে মাল বোঝাই করতে হয়, পাথর ভাঙ্‌তে হয়, রাস্তা ঝাঁট দিতে হয়, কাঠ কেটে কড়ি বরগা তক্তা

তৈরী করতে হয়, বেত ও বাঁশ কাটতে হয়, চা-বাগানের কাজ আছে, ফলের বাগানও আছে। সকাল থেকে দশটা অবধি কাজ, তারপর একটা অবধি স্নানাহারের ছুটী, তারপর আবার পাঁচটা অবধি কাজ। তারপর আহার ও সন্ধ্যা অবধি মনের সুখে ঘুরাফেরা ও গল্পগুজব! রবিবারে কোন কাজকর্ম নেই, সকালে দু'ঘণ্টা শুধু টাপুর চারিদিকের ঘাস ও আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয়। রাত আটটায় তোপ পড়লেই ব্যারাক বন্ধ হয়ে যায়। ব্যারাকগুলি কাঠের তৈরী, ছাদ টাইলের। দেয়াল বলে কিছু নেই, চারিদিকে কাঠের ব্যাটমের জাফ্রী ঘেরা। মেঝে কাঠের, তার উপর চট বা কম্বল বিছিয়ে তিন সারি লোক শোয়। পাশেই পায়খানা। এক একটী ব্যারাকে ষাট-সত্তর জন কয়েদী রাখার মত স্থান থাকে।"

এই আন্দামানে বারীনবাবু যেদিন প্রথম এলেন সেদিন জেলার ব্যারি-সাহেব তাঁকে বললেন—'এই যে পাঁচিল দেখেচো, এ এত নীচু কেন জান? কারণ এখান থেকে পালান এক রকম অসম্ভব। চারিদিকে এক হাজার মাইল সমুদ্র, বনে কেবল শূয়োর আর বনবেড়াল ছাড়া কোন জানোয়ারই নেই ব টে, কিন্তু জংলী আছে, তাদের নাম জেব্রাওয়ালা; তারা মানুষ দেখবামাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে চোখা চোখা তীর দিয়ে সাফ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। আমায় দেখতে পাচ্ছ? আমার নাম ডি, ব্যারি; সোজা ভালমানুষের কাছে আমি তার পরম হিতকারী, ব্যাঁকার কাছে আমি চতুর্গুণ ব্যাঁকা। আমার যদি অবাধ্য হও, তাহলে ভগবান তোমাদের সহায় হউন, আমি তো হবো না সেটা এক রকম স্থির; আর এই পোর্ট ব্লেয়ারের তিন মাইলের মধ্যে ভগবান আসেন না সেটা মনে রেখো!'

বন্দীজীবনের প্রথম সূচনা হোল এইভাবেই।

বারীনবাবুর দলের স্থান হোল পাঁচ নম্বর ব্লকে।

সকালে ফেনে-ভাতে এক ডাব্বু (নারিকেল মালার আধখানা) কাঞ্জি

খাবার পর একজন ওয়ার্ডার এক আঁটি নারিকেলের ছোব্‌ড়া দিয়ে গেল, বললো—রস্‌সি বাটো, অর্থাৎ দড়ি পাকাও!

কিন্তু কি করে দড়ি পাকাতে হয় তাই কেউ জানে না, কাজেই ওয়ার্ডার এসে শেখাতে বসলো।

দড়ি পাকানো শিখে বারীনবাবুরা রীতিমত দড়ি পাকাতে সুরু করলেন, কিন্তু যত ভালোই দড়ি পাকান না কেন, পেটী-অফিসার পাঠান খোয়েদাদ খাঁয়ের মনস্তুষ্টি করা কঠিন ছিল। "এই খাঁ-সাহেবের মন পাইবার জন্য আমরা না করিতাম এমন কর্মই নাই!....আমরা প্রাণপণে তাহার ধর্মবুদ্ধির প্রশংসা করিতাম, মুসলমান হইবার দুরাকাঙ্খাও জানাইতাম, খোয়েদাদের উচ্চ-হৃদয় ও মানুষ চরাইবার তারিফ করিতাম আর শুনিতে শুনিতে আনন্দে খাঁ-সাহেবের প্রায় দশাপ্রাপ্তি ঘটিত। আমি (বারীনবাবু) ও অবিনাশ convalescent gang-এ ছিলাম, এই কন্‌ভ্যালেসেণ্ট দলে নাম লিখা হইলে মাথা পিছু ১২ আউন্স দুধ পাওয়া যায়। আমি আমার দুধ লুকাইয়া মাঝে মাঝে খাঁ-সাহেবকে দিতাম, খাঁ-সাহেব তাহা দুই একবার আমতা আমতা করিয়া লইতেন এবং পরম পরিতোষ পূর্বক পান করিয়া দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে দন্ত বাহির করিয়া বলিতেন, 'ইয়া বিসমিল্লা। খোদানে কেয়া আজব চিজ্‌ বনায়া হায়।' বলা বাহুল্য এই দুধটুকু আমার ঘুষ।"

খোয়েদাদকে খুসী রাখার যথেষ্ট প্রয়োজনও ছিল, কারণ প্রহরীদের প্রধান অস্ত্র ছিল প্রহার ও গালাগালি। "রামলাল ফাইলে টেড়া হইয়া বসিয়াছে, দাও উহার ঘাড়ে দুইটা রদ্দা; মুস্তাফা আওয়াজ দিবামাত্র খাড়া হয় নাই, অতএব উহার গোঁফ ছিঁড়িয়া লও; বাকাউল্লার পাইখানা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছে, অতএব তিন ডাণ্ডা লাগাইয়া উহার পশ্চাদ্দেশ ঢিলা করিয়া দাও।—এইরূপ বহুবিধ সদ্যুক্তির প্রয়োগে তাহারা জেলখানার শান্তিরক্ষা করে।"

রসি পাকানোর ছ'মাস পরে এলো ঘানি টানার কাজ। প্রত্যহ এক এক

জনকে দশ পাউণ্ড সরিষার তৈল অথবা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তৈল পিষতে হবে। কাজটা মোটেই সহজ নয়। এক ঘণ্টা ঘানি টানলে গা হাত পা আড়ষ্ট হয়ে ওঠে, হাতে পড়ে ফোস্কা। এলাহাবাদের 'স্বরাজ' কাগজের সম্পাদক পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয় নন্দগোপাল আপত্তি তুললেন—'অতো জোরে ঘানি ঘুরানো আমার পোষাবে না।' সারাদিনে নন্দগোপাল মাত্র পনেরো পাউণ্ড নারিকেল তৈল পিষলেন, বললেন,—'আমি তো আর সত্য-সত্যই কলুর বলদ নই যে সমস্ত দিনই তেল পিষবো। দিনে তো দু' পয়সারও খোরাক পাই না, তা ত্রিশ পাউণ্ড তেল পিষবো কেমন করে?' সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নন্দলালের পায়ে বেড়ী দিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য কুঠরীতে বন্ধ করলেন। এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ্য করেই কিছুদিনের মধ্যে ঘানির কাজে ধর্মঘট সুরু হোল। সবাইকার সাজা হয়ে গেল,—সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ি আর চার দিন কাঞ্জি ভক্ষণ এবং কারও সঙ্গে কথা বলা নিষেধ।

কিন্তু এক একজনকে শেষ পর্যন্ত তিন মাস কুঠরীতে বন্ধ রেখেও যখন সুবিধা হোল না, তখন কর্তৃপক্ষ এঁদেরকে জেলের বাহিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। বারীন গেলেন রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে মজুরী করতে, উল্লাসকর গেলেন মাটি কেটে ইট বানাতে। কেউ গেলেন জংগলের কাঠ কাটতে, কেউ রিক্সা টানতে আবার কেউ-বা গেলেন বাঁধ বাঁধতে।

কিন্তু এই বাইরে আসাই বিপদের ব্যাপার হোল। "প্রাতঃকালে ছ'টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্ণে ১টা হইতে ৪॥০টা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম তো করিতেই হইবে, অধিকন্তু রৌদ্রে পুড়িতে ও বৃষ্টিতে ভিজিতে হয়। একে তো পোর্ট ব্লেয়ারে বৎসরে সাত মাস বর্ষাকাল! তাহার উপর জংগলে জোঁকের উপদ্রব। ....তাহার উপর পূরা খোরাক মেলে না। কয়েদীর খোরাক চুরি হইয়া বাজারে ও গ্রামে গ্রামে বিক্রী হয়। সাধারণ কয়েদী হইতে ইউরোপীয় কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই এই চুরির কথা বেশ জানেন, কিন্তু চুরি কখনও বন্ধ হয়

না। অধিকাংশ কর্মচারীই ঘুষখোর; সুতরাং এই চুরি-রোগের প্রতিকার নাই।"

কিন্তু বাইরের জীবন বেশী দিন সইল না, খাটুনি অত্যধিক, অসুখ করলে জ্বর-গায় বিছানা ও থালা বাটি ঘাড়ে করে পাঁচ, সাত, দশ মাইল হেঁটে হাসপাতালে আসতে হয়, হাসপাতালে যে সব ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয় সেই সব ছোট ছোট কুঠরীগুলিতে কোন দিন এতটুকু বাতাস ঢোকে না, তার উপর সেই ঘরের মধ্যেই মলমূত্র ত্যাগের জন্য একটা গামলা পাতা থাকে। সেলুলার জেলের বাইরে মুক্তির যে আনন্দ বন্দীরা আশা করেছিল, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সে আশা নির্মূল হোল, এবং বোমারুরা একে একে কাজ করতে অস্বীকার করে আবার জেলে ফিরে এলেন।

কিন্তু জেলের ভিতরের ব্যাপারও ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠলো। ইন্দুভূষণ রায় মাঝে মাঝে আর সইতে না পেরে বলতেন—'জীবনের দশটা বছর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব!' একদিন রাত্রে নিজের জামা ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগিয়ে গলায় ফাঁসী দিয়ে তিনি ঝুলে পড়লেন। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাত্রেই খবর পেয়েছিলেন, কিন্তু বেলা আটটার আগে তিনি এলেন না। প্রহরীরা বলে ইন্দুভূষণের গলার হাঁসুলীতে (neck ticket) একখণ্ড লেখা কাগজ বাঁধা ছিল, কিন্তু সেই কাগজখানির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে ইন্দুভূষণের বড়ভাই অভিযোগ করেন, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

উল্লাসকর দত্তের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিল না। তবু তাঁকে রোদে ইট তৈরী করার কাজ দেওয়া হয়। উল্লাসকর বললেন—'এ কাজ আমি করবো না।'

সুপার তাঁকে সাজা দিলেন—সাত দিন দাঁড়া হাতকড়ি।

প্রথম দিন বেলা সাড়ে চারটের সময় হাতকড়ি খুলতে গিয়ে পেটী-অফিসার দেখলো উল্লাসকর জ্বরে অজ্ঞান হয়ে হাতকড়িতে ঝুলছেন। তখনই তাঁকে

হাসপাতালে পাঠানো হোল, সেই রাত্রে জ্বর উঠতে উঠতে একেবারে ১০৬ ডিগ্রীতে গিয়ে থামলো। সকাল বেলা উল্লাসকরের জ্বর নাবলো বটে, কিন্তু দেখা গেল তিনি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন।

এই ধরণের ঘটনা আন্দামানে তখন প্রায়ই ঘটতো। আমেরিকার 'গদর' দলের এক বৃদ্ধ শিখকে জেলের মধ্যে এমন প্রহার করা হয় যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। একজন অনাচারের হাত থেকে মুক্তি কামনায় এক খণ্ড সীসা খেয়ে আত্মহত্যা করেন! বালেশ্বর মামলার আসামী যতীশচন্দ্র পাল সেলের মধ্যে বদ্ধ অবস্থায় পাগল হয়ে যান। লায়লপুর স্কুলের শিক্ষক ছত্র সিং ও অমর সিংকে একদিন প্রহরীরা মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলে, তারপর পূরো দু'টি বছর তাঁদেরকে এক একটি সেলে বন্ধ করে রাখে। "বারান্দার এক কোণে জাল দিয়া ঘিরিয়া তাঁহার জন্য পিঁজরা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেই পিঁজরার মধ্যেই তাঁহাকে আহার, ভাঁড়ে শৌচ প্রস্রাবাদি ত্যাগ ও রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতে হইত। ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তাঁহাকে ক্রমে মরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল।" শ্যামদেশ থেকে ধৃত বিপ্লবী পণ্ডিত রামরক্ষা আন্দামানে আসার পর তাঁর পৈতা কেড়ে নেওয়া হয়, তিনি তাঁর প্রতিবাদে আহার ত্যাগ করেন ও পরে যক্ষারোগে তাঁর মৃত্যু হয়। দয়ানন্দ কলেজের অধ্যাপক ভাই পরমানন্দ লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য অনশনে প্রাণত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন। পরে সম্রাটের ঘোষণা অনুযায়ী তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই সব অনাচারের ফলে কয়েদীদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং অনশন ও ধর্মঘট ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়। ভারতে বড়লাটের দরবারে এই সম্পর্কে কথা উঠে, শেষে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত গবর্মেণ্ট আন্দামানে জেল-কমিশন পাঠান। রাজনৈতিক কয়েদীরা তাঁদের কাছে দাবী করেন:

আন্দামানের জলহাওয়া অস্বাস্থ্যকর, ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান। এখানে

জেলখানা রাখার জন্য ভারত সরকারকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়। দণ্ডনীতির মূলকথা যে চরিত্র সংশোধন তা এখানে হয় না, বরং এখানে মানুষের সদ্‌বৃত্তিগুলি একেবারে নির্মূল হয়ে যায়। এখানে যে প্রথা প্রচলিত তা পূর্বকালের দাস ব্যবসায়েরই রূপান্তর মাত্র। বৎসরে একবারের অধিক তারা বাড়ীতে চিঠি লিখতে পায় না, স্নেহ-মমতা ও আশাহীন জীবনে তারা নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্ধ হয়ে ওঠে। কয়েদীদের দিয়ে ক্রীতদাসের পরিশ্রম করিয়ে নেওয়া হয়। জঙ্গলে কাঠ কাটা, রবারের কাজ, ইট ও চূণ প্রস্তুত করা বাস্তবিকই এত কঠিন যে কয়েদীরা অনেক সময় কাজের ভয়ে জংগলে পালিয়ে যায়, এবং দেশে ফেরার আশা নেই দেখে আত্মহত্যা করে। কয়েদীর চিকিৎসার কোন ভালো ব্যবস্থা নেই। জেলে প্রায় ৮০০ কয়েদীর স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ভার একজন সাব-এসিষ্টেণ্ট সার্জনের উপর ন্যস্ত, হাসপাতালে রোগী দেখে তিনি আর জেলের মধ্যে কয়েদীদের দেখার সময় পান না। দশ বৎসর পরে কয়েদীদের সরকারী চাকরীতে ভর্তি করে মাসিক সাত টাকা মাত্র বেতন দেওয়া হয়, তা থেকে থাকার জন্য আট আনা ভাড়া কেটে নেওয়া হয়, সাড়ে ছ'টাকায় কারও জীবিকা চলে না। এই সব ব্যাপারের প্রতিকার করতে হলে, আন্দামান থেকে কয়েদীদের বাসস্থান তুলে দেওয়াই কর্তব্য। রাজনৈতিক কয়েদীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সাধারণ কয়েদীদের কষ্টগুলি তাদের ভোগ করতে হয়, কিন্তু সাধারণ কয়েদীদের সুযোগ-সুবিধাগুলি তারা পায় না। লেখাপড়া জানলে সাধারণ কয়েদীরা মুন্সী বা কেরাণীর কাজ করতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক কয়েদী যত শিক্ষিতই হোক তাকে দড়ি পাকিয়ে ও ছোবড়া পিটিয়েই দিন কাটাতে হয়। পুস্তকাদি পড়তে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। পরস্পরে কথা কহা নিষিদ্ধ। কারও অসুখ করলে তাকে হাসপাতালে না রেখে স্বতন্ত্র সেলের মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয়। সে ঘরের পিছনে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা ছাড়া বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা থাকে না,—সুস্থ মানুষই

সেখানে হাঁপিয়ে ওঠে, অসুস্থের তো কথাই নাই। "একে তো আহারাদির বিষম কষ্ট, তাহার উপর যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম তাঁহাদের করিতে হয়, তাহাতে তাঁহারা অভ্যস্ত নহেন। রোগে চিকিৎসা নাই; তাহার উপর কথায় কথায় দণ্ড। সব চেয়ে অধিক কষ্ট অশিক্ষিত ইতর শ্রেণীর লোকদের কর্তৃত্বাধীনে জীবন যাপন করা। উঠিতে বসিতে যেরূপ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয় তাহাতে সহজ অবস্থাতেই মানুষের মাথা খারাপ হইয়া যায়, কয়েদী তো দূরের কথা!"....ইহা অপরাধের দণ্ড, না বিদ্বেষপ্রসূত নির্যাতন?

এই সব লেখালিখি ও ধর্মঘট করার ফলে কর্তারা রাজনৈতিক বন্দীদের কিছুটা সুবিধা দিতে স্বীকার করলেন। দু'বছর জেল-জীবনের পর বারীনবাবু বাইরের কাজ পেলেন। "ছুটীর সময় বনের শ্যাম নিথর শান্তিতে আপন খেয়ালে বেড়াইবার সুখ, এই বঞ্চিত প্রাণ কয়টীতে অমৃতের কাজ করিত। কিন্তু পরক্ষণেই নিত্য কর্তব্যের কঠোরতা ও রৌদ্রের কষ্টে এমন আনন্দও বিষাক্ত হইয়া উঠিত।" বছরে একবার বাড়ীতে চিঠি লেখা চলতো, যার বাড়ীতে কিছু সঙ্গীত আছে সে কুড়ি পঁচিশখানি করে বই আনিয়ে নিত। এই বইগুলি সেণ্ট্রাল-টাওয়ারে জমা থাকতো, সপ্তাহে একবার—প্রতি রবিবার এক একজন একখানি করে বই পেতেন, কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীরা প্রায় বগলদাবায় লুকিয়ে আরো দু-একখানি বই টেনে আনতেন।

আন্দামানে কয়েদীদের খাদ্যের বরাদ্দ ছিল দু'বেলায় চাউল দেড়পোয়া, আটা পাঁচ ছটাক, ডাল আধ পোয়া, তরকারী আধ সের। এই খাদ্য কিছুদিন খেলেই অগ্নিমান্দ্য অবশ্যম্ভাবী। মাঝে মাঝে এই আহার্যের মধ্যে একটু বৈচিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টায়, বারীনবাবুকে অনেক প্রকারের চুরি অভ্যাস করতে হয়েছিল। "ভাণ্ডার বা পাকশালা হইতে লবণ, লঙ্কা ও তেঁতুল এবং সাত নম্বর হইতে নারিকেল চুরি করিয়া চাটনি পেষাইতে পারিলে সেদিন অমন আধকাঁচা রুটি ও পিণ্ডিভাত কি সুমিষ্টই না লাগিত। নারিকেলের জল, ফুল ও দই-নারিকেল

চুরি করিয়া খাওয়া স্বধর্মে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।" মাঝে একদিন এক পাঠান ওয়ার্ডার রান্না-করা মাংস এনে লুকিয়ে রাত্রে খাইয়েছিল, আর একদিন পুরানো কয়েদী রুটির সঙ্গে চিনি ও টাট্‌কা নারিকেল তৈল মাখিয়ে খেতে দিয়েছিল। সেই দিন দু'টি দ্বীপান্তর-জীবনের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।

প্রায় ছ'বছর জেলে থাকার পর, বারীনবাবুরা রেঁধে খাবার অনুমতি পান। "জেলের পাকশালা হইতে রাঁধা ভাত, ডাল ও রুটি লইতাম, ও বাজার হইতে তরকারী, ডিম, মাছ কিনিয়া রাঁধিতাম ....সরকারী দুধ চারজনে বার আউন্স করিয়া ৪৮ আউন্স পাইতাম, তাহাতে সকালে ও দুপুরে চা চলিত। শেষ দুই বৎসর দুর্গোৎসব ও বড়দিনের দিন পোলাও লুচি মাংস যাহা ইচ্ছা আয়োজন করিয়া এক ভোজের ব্যবস্থা করা হইত।... হেমচন্দ্র ও উপেন নিত্য পেঁয়াজ দিয়া মাছের ঝোল ও পেঁয়াজের সহিত পাঁচফোড়ন দিয়া মোচার ঘণ্ট রাঁধিত।.... রান্নাঘরের আশে-পাশে লঙ্কার চারা, পুদিনা, লাউকুমড়ার ডগার বাগান পর্যন্ত হইয়াছিল।" সারাদিন পরিশ্রমের মধ্যে এইটুকুই ছিল আনন্দ, তার উপর ছিল অখণ্ড ভগবদ্ বিশ্বাস, যা বন্দী জীবনের দুঃখ কষ্ট থেকে মনকে কিছুটা নির্লিপ্ত করে রেখেছিল ঃ

যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিত চিত্ত
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব ॥

[যোগরতই থাক, ভোগরতই থাক, সঙ্গ কামনা কর, বা নিঃসঙ্গ হও, ব্রহ্মচিন্তায় মনোনিবেশ করলে যে আনন্দ লাভ হবে তা-ই যথার্থ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ।]

আন্দামানের সেলুলার জেলের কলুষিত পরিবেশের মাঝে ভগবদ্‌বিশ্বাস ছাড়া আর কি অবলম্বন করে মানুষ বাঁচতে পারে!

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—

কারা জীবন

মুরারীপুকুরের বাগানবাড়ীতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে উপেনবাবুও গ্রেপ্তার হন। প্রথম দিন থানাতেই থাকতে হয়, সেদিন তিনখানি পুরী ভিন্ন আর কিছুই তাঁর অদৃষ্টে জোটেনি। পরদিন দুপুরবেলা লালবাজার পুলিস কোর্টে সকলকে হাজির করা হোল, বোমারু দলের ছেলেদের অনেকেরই মুখ তখন শুকিয়ে গেছে। "একটী ছেলে কাছে আসিয়া বলিল—'দাদা, পেটের জ্বালাতেই মরে গেলুম! কাল সমস্ত দিন পেটে ভাত পড়েনি। দুপুরবেলা শুধু দুটি মুড়ি খেতে দিয়েছিল।"

"বারীন্দ্র লাফাইয়া উঠিল। কাছেই ইন্‌সপেক্‌টার বিনোদ গুপ্ত দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে বলিল—'বাপু, আমাদের ফাঁসী-মাসী যা কিছু দিতে হয় দাও; ছেলেগুলোকে অমন করে দগ্ধাচ্ছ কেন?'

"বিনোদ গুপ্ত তাড়াতাড়ি—'এই, ইয়া ল্যাও, উয়া ল্যাও' করিয়া একটি সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টার বাবুর উপর খাবার আনিবার হুকুম চালাইলেন, সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টার বাবুটী হেড কন্‌স্‌টেবল্ ও হেড কন্‌স্‌টেবল্‌টী একজন অভাগা কন্‌স্‌টেবলের উপর হুকুম জাহির করিয়া সরিয়া পড়িলেন। ফলে পুনঃ পুনঃ তাগাদায় এক গ্লাস জল ভিন্ন আর কিছু আসিয়া পৌঁছিল না। বিনোদ গুপ্তকে সে কথা জানাইলে তিনি একজন কাল্পনিক কন্‌সটেবলের উপর ভাটার মত

চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া অজস্র গালিবর্ষণ করিতে করিতে কোথায় যে অন্তর্হিত হইলেন তাহা আমরা খুঁজিয়াও পাইলাম না।"

তারপর পুলিশ-কোর্ট থেকে আলিপুর-কোর্ট। যাবার পথে পুলিশ দু'খানি করে কচুরী ও একটী করে সিঙ্গারা খেতে দিল। সেখান থেকে সন্ধ্যাবেলা আলিপুর-জেল। "জেল তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে; অন্নব্যঞ্জনও প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জেলারবাবু কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া এক এক মুঠো ভাত ও একটু করিয়া ডাল আমাদের খাইতে দিলেন। প্রায় দুই দিন অনাহারের পর সেই একমুঠা ভাতই যেন অমৃত বলিয়া মনে হইল।"

আলিপুর-জেলের যে কুঠরীর মধ্যে উপেন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছিল সেটী পাঁচ হাত লম্বা সাত হাত চওড়া একখানি ঘর। উপেনবাবু ছাড়া আরও দু'জন রাজনৈতিক কয়েদী ছিলেন এই ঘরে। "সেই কুঠরীর এক কোণে শৌচ প্রস্রাবের জন্য দুইটি গামলা। তিনজনকেই সেইখানে কাজ সারিতে হয়; সুতরাং একজনকে ঐ অবশ্য-কর্তব্য অশ্লীল কর্মটুকু করিতে গেলে আর দুই-জনের চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরীর সামনে একটী ছোট বারান্দা। সেইখানে হাত মুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান, আর তার পরেই অভ্রভেদী প্রাচীর। প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুশূল। সেটা যেন অহরহঃ চীৎকার করিয়া বলিত—'তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে যখন পড়িয়াছ তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।' প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশ্বত্থ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল ঐ টুকু লইয়াই।"

জেলের ভোজনব্যবস্থা ছিল কদর্য। "প্রথম দিন তাহা দেখিয়া হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল। সকালবেলা উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান বালতি হইতে সাদা সাদা কি

খানিকটা আমাদের লোহার থালের উপর ঢালিয়া দিয়া গেল, শুনিলাম ইহাই আমাদের বাল্যভোগ এবং আলিপুরী ভাষায় ইহার নাম 'লপ্‌সী'। লপ্‌সী কি রে বাবা!....'ওহো! এ যে ফেনমিশান ভাত!'—পরদিন দেখিলাম ডালের সহিত মিশিয়া লপ্‌সী পীতবর্ণ ধরিয়াছে, তৃতীয় দিন দেখিলাম উহা রক্তবর্ণ। শুনিলাম উহাতে গুড় দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই আমাদের প্রাতরাশের রাজ-সংস্করণ। সাড়ে দশটার সময় একটা টিনের বাটির এক বাটি রেঙ্গুন চালের ভাত, খানিকটা অড়হর ডাল, কি খানিকটা পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ ও একটু তেঁতুলগোলা। সন্ধ্যার সময়ও তদ্‌বৎ, কেবল তেঁতুলগোলাটুকু নাই।"

জেলার ও ডাক্তারবাবু যখন দেখা করতে এলেন, বোমারু আসামীর দল তখন একবাক্যে প্রতিবাদ জানালো। ডাক্তারবাবুও সব শুনে বললেন—উপায় নাই। জেলের কয়েদীর খোরাক একেবারে সরকারের হিসাবমত বাঁধা। তবে যদি কারও অসুখ-বিসুখ হয় তার জন্য তিনি হাসপাতালে আলাদা বন্দোবস্ত করতে পারেন; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় এছাড়া অন্যরকম খাবার দেবার কোন অধিকার তাঁর নেই।

জেলার বললেন—জেলের বাগানে আলু বেগুন কুমড়া পেঁয়াজ প্রভৃতি সব তরকারীই ত হয়। জেলের খোরাক ত মন্দ নয়।

পনের বছরের ছেলে শচীন সেন নিতান্ত ঠোঁটকাটা ছেলে, সে বলে উঠলো —বাগানে তো হয় সবই; কিন্তু পুঁই ডাঁটা আর এঁচোড়ের খোসা ছাড়া বাকী সবগুলো বোধ হয় রাস্তা ভুলে অন্যত্র চলে যায়।

কাজেই এই অখাদ্য ভোজনের হাত থেকে উদ্ধার পেতে হলে, অসুখ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দলের সকলকারই অসুখ করতে লাগলো। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই একে একে সব অসুখ ফুরিয়ে গেল,—পেট কামড়ান, মাথা ধরা, বুক দুর্‌দুর করা, গা বমি বমি করা—সব শেষ। কিন্তু রোগ তো

একটা কিছু চাই না হলে প্রাণ যে বাঁচে না। বাইরে প্রকাশ পায় না এমন একটা অসুখ তো আবিষ্কার করতে হবে! পণ্ডিত হৃষিকেশ ছিলেন দলেরই একজন, গম্ভীরভাবে তিনি একদিন ডাক্তারকে বললেন—আমার বাঁ চোখের উপরের পাতা তিন দিন ধরে নাচছে, আমার যে একটা কঠিন অসুখ হচ্ছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। হাসপাতালের অন্ন ভিন্ন আমার আর বাঁচবার উপায় নেই।

ডাক্তারবাবু জাতে আইরিশ, পণ্ডিত হৃষিকেশের অসুখ শুনে তিনি খানিকটা হাসলেন, তারপর পণ্ডিতের জন্য হাসপাতালের অন্নেরই ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলেন।

হঠাৎ উপেন্দ্রনাথ একটা পথ আবিষ্কার করে ফেললেন। "সেটা এই যে পয়সা থাকিলে জেলখানার মধ্যে বসিয়া সবই পাওয়া যায়। জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলেই ভাতের ভিতর হইতে কৈ মাছ ভাজা ও রুটির গাদার ভিতর হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারী বাহির হইয়া আসে; এমন কি পাহারাওয়ালার পাগড়ীর ভিতর হইতে পাণ ও চুরুট বাহির হইতে দেখা গিয়াছে।"

জেলখানার একটা বড় অসুবিধা ছিল যে এক কুঠরীর কয়েদীর অন্য কুঠরীর কয়েদীর সঙ্গে কথা কইবার হুকুম ছিল না। প্রথমে লুকিয়ে দু-একটা কথা কওয়া হোত, কিন্তু পাহারাওয়ালারা শুনতে পেলেই জেলারের কাছে রিপোর্ট করার ভয় দেখাত। সহসা একদিন দেখা গেল যে তারা বেশ শান্তশিষ্ট হয়ে গেছে, কয়েদীরা চীৎকার করে কথা বললেও আর তারা শুনতে পায় না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে এক বন্ধু রৌপ্যখণ্ড ঘুষ দিয়ে তাদের কানের ছিদ্র বন্ধ করে দিয়েছেন। এমন কি জেলার বা জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসার সময় তারাই কয়েদীদেরকে সাবধান করে দিত।

ইতিমধ্যে পুলিশ আরো অনেককে ধরে আনলো, এবং একটী বড় ওয়ার্ডে

তাদের সকলের থাকার ব্যবস্থা হোল। জেলের মধ্যেই বোমারুদের দিব্যি এক ক্লাব সৃষ্টি হোল। "সন্ধ্যার সময় গানের আড্ডা বসিত। হেমচন্দ্র, উল্লাসকর, দেবব্রত কয়জনেই বেশ গাহিতে পারিত।...ছেলেরা সকলেই সেকালের স্বদেশী গান গাহিত, তাহাদের অদম্য উৎসাহ আর স্ফূর্তি চাপিয়া রাখাই দায়! ....রবিবার আমাদের স্ফূর্তির মাত্রা একটু বাড়িয়া যাইত। আত্মীয়স্বজন ও বাহিরের অনেক লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন সুতরাং অনেক প্রকার সংবাদাদি পাওয়া যাইত। মিষ্টান্নও যথেষ্ট পরিমাণে মিলিত। বিপুল হাস্যরসের মাঝে মাঝে একটু আধটু করুণরসও দেখা দিত। শচীনের পিতা একদিন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। জেলে কি রকম খাদ্য খাইতে হয় জিজ্ঞাসা করায় শচীন লপ্‌সীর নাম করিল।....পিতার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, তিনি জেলারবাবুর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন— 'বাড়ীতে ছেলে আমার পোলাওয়ের বাটি টান মেরে ফেলে দিত; আর আজ লপ্‌সী তার কাছে খুব পুষ্টিকর জিনিষ!'....একদিন আমার (উপেনবাবুর) আত্মীয়-স্বজনেরা আমার ছেলেকে আমার সহিত দেখা করাইতে লইয়া আসিলেন। ছেলের বয়স তখন দেড় বৎসর মাত্র; কথা কহিতে পারে না। হয়ত এ জন্মে তাহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া তাহাকে কোলে লইবার বড় সাধ হইয়াছিল। কিন্তু মাঝের লোহার রেলিংগুলো আমার সে সাধ মিটাইতে দেয় নাই।"

ইতিমধ্যে আলিপুর-জেলে একটি হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল। নরেন গোঁসাই ছিল বোমার মামলার আসামী, সে সরকারী সাক্ষী হয়ে দলের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করলো। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যে কোনরকমে দু'টি রিভলবার জোগাড় করে একদিন নরেনকে গুলি করে মারলেন। জেলখানার মধ্যে হুলুস্থুলু পড়ে গেল, বোমার মামলার আসামীদের অদৃষ্টও পুড়লো। ব্যারাকের মধ্যে বোমার মামলার আসামীদের বিছানাপত্র

তল্লাসী করে দেখা হোল। ইন্‌স্‌পেক্টার-জেনারেল্ হুকুম দিলেন—কাউকে আর একত্র রাখার দরকার নেই, প্রত্যেককে পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ করে রাখা হোক!

এক সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেককে ৪৪ ডিগ্রী সেলে বন্ধ করা হোল। "হাসপাতালে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। অসুখ হইলে কুঠরীর মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইত। কাহার সহিত আর কাহারও কথা কহিবার উপায় রহিল না। সমস্ত দিন কুঠরীর মধ্যে খাও-দাও, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাক। জেলের অন্যান্য অংশ হইতেও কোন লোক ৪৪ ডিগ্রীতে ঢুকিতে পাইত না। দেশী প্রহরীর পরিবর্তে ইউরোপীয় প্রহরী আসিল, আর দিনের বেলা ও রাত্রিকালে দুই দল গোরা সৈন্য আসিয়া জেলের ভিতরে ও বাহিরে পাহারা দিতে আরম্ভ করিল। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হইয়াছিল যে আমরা বোধ হয় জেল হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করিব।....প্রাতঃকালে ও বৈকালে আধ ঘণ্টা করিয়া উঠানের মধ্যে ঘুরিতে পাইতাম ; কিন্তু সকলকেই পরস্পরের কাছ হইতে দূরে দূরে থাকিতে হইত। প্রহরীদের চক্ষু এড়াইয়া কথা কহিবার সুবিধা হইত না। সমস্ত দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকার যে কি যন্ত্রণা তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার উপায় নাই। একদিন সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট সাহেবের নিকট হইতে পড়িবার জন্য বই চাহিলাম। তিনি দুঃখের সহিত জানাইলেন যে গভর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতীত আমাদের সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিতে পারেন না। নরেনের মৃত্যুর পর তাঁহার হাত হইতে সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।"

অন্যান্য কয়েদীরা উঠানে সকালে বিকালে বেড়াতে পারতো কিন্তু কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের সেলের দরজা সব সময়েই বন্ধ থাকতো। একদিন দেখা গেল কানাইলালের দরজা খোলা। সকলে তাঁর ঘরে গেল, প্রহরী বাধা দিল না। পরে জানা গেল কানাইলালের ফাঁসী হবে তাই প্রহরী তাঁকে সকলের সঙ্গে শেষ

দেখা করার সুবিধা করে দিয়েছে। সেদিন উপেন্দ্রনাথ কানাইলালের যে মুখ দেখেছিলেন—"আজও সে ছবি মনের মধ্যে স্পষ্টই জাগিয়া রহিয়াছে, জীবনের বাকী কয়টা দিনও থাকিবে। জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি ; কানাইয়ের মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিষাদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনি ফুটিয়া রহিয়াছে।....প্রহরীর মুখে শুনিলাম ফাঁসীর আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে!"

একদিন প্রভাতে কানাইলালের ফাঁসী হয়ে গেল।

বোমারুদের বিচার চলতে লাগলো, ইন্‌স্‌পেক্টার শ্যামশূল আলম সরকার পক্ষে মামলার তদ্বির করতেন, বোমারু ছেলেরা তাঁকে লক্ষ্য করে গান গাহিত—

"ওগো সরকারের শ্যাম তুমি,
আমাদের শূল,
তোমার ভিটেয় কবে চরবে ঘুঘু
তুমি দেখবে চোখে সরষে ফুল!"

বোমারুদের হৈ-হুল্লোড়ে আদালতের কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হোত, জজ-সাহেব হাতকড়ি লাগাবার ভয় দেখাতেন, ব্যারিষ্টাররা ছুটে এসে অরবিন্দবাবুকে অনুরোধ করতেন—ছেলেদের একটু থামতে বলুন!

অরবিন্দবাবু উত্তর দিতেন—ছেলেদের উপর আমার কোন হাত নেই।

"এই হট্টগোল ও দলাদলির মধ্যে একেবারে নিশ্চল স্থাণুর মত বসিয়া থাকিতেন অরবিন্দবাবু। কোন কথাতেই হ্যাঁ, না, কিছুই বলিতেন না। জেলের প্রহরীদের নিকট হইতে তাঁহার আচরণ সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাইতাম। কেহ বলিত তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না, কেহ বলিত তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন! ভাত খাইবার সময় আরশুলা, টিকটিকি ও পিঁপড়াদের ভাত খাইতে দেন ; স্নান করেন না, মুখ ধোন না, কাপড় ছাড়েন না,—

ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্যাপারটা জানবার জন্য বড় কৌতূহল হইত। কিন্তু
তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস কুলাইত না। মাথায় মাখিবার
জন্য আমরা কেহই তেল পাইতাম না; কিন্তু দেখিলাম অরবিন্দবাবুর চুল যেন
তেলে চক্‌চক্ করিতেছে। একদিন সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—
আপনি কি স্নান করিবার সময় মাথায় তেল দেন?

অরবিন্দবাবুর উত্তর শুনিয়া চমকিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন—আমি ত
স্নান করি না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার চুল অত চক্‌চক্ করে কি করিয়া?

অরবিন্দবাবু বলিলেন—সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে কতকগুলো
পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। আমার শরীর থেকে চুল বসা (fat) টানিয়া
লয়।

দুই একজন সন্ন্যাসীর ওরূপ দেখিয়াছি; কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া
বুঝি নাই। তাহার পর ডকের মধ্যে একদিন বসিয়া থাকিতে থাকিতে লক্ষ্য
করিলাম যে অরবিন্দবাবুর চক্ষু যেন কাচের চক্ষুর মত স্থির হইয়া আছে;
তাহাতে পলক বা চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই। কোথায় পড়িয়াছিলাম যে চিত্তের
বৃত্তি একেবারে নিরুদ্ধ হইয়া গেলে চক্ষে ঐরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দুই
একজনকে তাহা দেখাইলাম; কিন্তু কেহই অরবিন্দবাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা
করিতে সাহস করিল না। শেষে শচীন আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—আপনি সাধনা করে কি পেলেন?

অরবিন্দ সেই ছোট ছেলেটীর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন—
যা খুঁজছিলাম, তাই পেয়েছি।

তখন আমাদের সাহস হইল, আমরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলাম।
অন্তর্জগতের যে অপূর্ব কাহিনী শুনিলাম তাহা যে বড় বেশী বুঝিলাম তাহা
নহে....এ সমস্ত গুহ্য সাধনের কথা তিনি কোথায় পাইলেন জিজ্ঞাসা করায়

অরবিন্দবাবু বলিলেন যে একজন মহাপুরুষ সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাকে এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়া যান। মোকর্দমার ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—আমি ছাড়া পাব!"

হোলও তাই। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেলেন। বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকরের ফাঁসীর হুকুম হোল, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দশজনের দশ বছর করে দ্বীপান্তরের আদেশ হোল। "ফাঁসীর হুকুম শুনিয়া উল্লাসকর হাসিতে হাসিতে জেলে ফিরিয়া আসিল; বলিল—দায় থেকে বাঁচা গেল।

একজন ইউরোপীয় প্রহরী তাহা দেখিয়া তাহার এক বন্ধুকে ডাকিয়া বলিল—দেখ, লোকটার ফাঁসী হইবে তবু সে হাসিতেছে।

তাহার বন্ধু আইরিশ; সে বলিল—হ্যাঁ, আমি জানি; মৃত্যু তাহাদের কাছে পরিহাসের জিনিষ।"

যারা ছাড়া পেল তারা হাসতে হাসতে বাহির হয়ে গেল, উপেন্দ্রনাথেরাও তাঁদেরকে হাসতে হাসতে বিদায় দিলেন; "কিন্তু সে হাসির তলায় তলায় একটা যেন বুকফাটা কান্না জমাট হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটা যেন হঠাৎ অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িল। পণ্ডিত হৃষীকেশ মূর্তিমান বেদান্তের মত বলিয়া উঠিলেন—আরে কিছু নয়, এ একটা দুঃস্বপ্ন!

হেমচন্দ্র বুকে সাহস বাঁধিয়া বলিল—কুচ্ পরোয়া নেহি; এভি গুজর যায়েগা।

বারীন্দ্র ফাঁসীর হুকুম শুনিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সেজদা (শ্রীঅরবিন্দ) বলে দিয়েছে, ফাঁসী আমার হবে না।

আমিও সকলকার দেখাদেখি হাসিলাম।....মনটা যেন নিতান্ত অসহায় বালকের মত দিশেহারা হইয়া উঠিল। বাকী জীবনটা জেলখানাতেই কাটাইয়া দিতে হইবে! উঃ! এর চেয়ে যে ফাঁসী ভাল।"

মানসিক এই অশান্তির মধ্যেও মাঝে মাঝে কারাগারের নিরবচ্ছিন্ন

একঘেয়েমির রূপান্তর ঘটতো। একদিন পাশের কুঠরীতে একটী ছেলে চীৎকার করে এমন গান গেয়ে উঠলো, যা শুনে না হেসে থাকার উপায় নেই! সেই চীৎকারের জন্য চার দিন তার চালগুঁড়া সিদ্ধ খাবার ব্যবস্থা হোল। আর একটি ছেলে একদিন দেয়ালের চূণ খসিয়ে দরজার গায়ে লিখে রাখলো—Long live Kanailal! তারও চার দিন চালগুঁড়া সিদ্ধের ব্যবস্থা।

"প্রহরীদের মধ্যে সকলেই আমাদের জব্দ করিবার চেষ্টায় ফিরিত; কিন্তু দু-একজন বেশ ভালমানুষও ছিল। আমাদের মধ্যে যাহারা সাজা খাইত তাহাদের জন্য একজন ইউরোপীয় প্রহরীকে পকেটে করিয়া কলা লুকাইয়া আনিতে দেখিয়াছি চুপি চুপি কলা খাওয়াইয়া বেচারা পকেটে পূরিয়া খোসাগুলি বাহিরে লইয়া যাইত।"

তারপর একদিন আন্দামান যাবার জন্য জাহাজে উঠতে হোল। একজন সার্জেণ্ট বিদ্রূপ করে বললো—Now say, 'My native land, farewell.'

উপেনবাবু বললেন—Au revoir!

তিন দিন তিন রাত জাহাজের এক খোলের মধ্যে কাটিয়ে তাঁরা পোর্ট ব্লেয়ারে এসে পৌছলেন। জায়গাটী রমণীয়। সারি সারি নারিকেল গাছের শ্রেণী, তারই মাঝে সাহেবদের ছোট ছোট বাংলো, যেন একখানি ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি।

ডাঙ্গায় নেবে বিছানা মাথায় করে পায়ের বেড়ী বাজাতে বাজাতে উপেন্দ্রনাথ জেলে এসে ঢুকলেন। একজন বেঁটে সিপাহী তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—এই যে এসেছ! ঐ দেখছো বাড়ীটা, ওখানে আমরা সিংহদের পোষ মানাই! ওখানে তোমার বন্ধুদের দেখতে পাবে, কিন্তু খবরদার, কথা ক'য়ো না।

ইনিই আন্দামান জেলের কর্তা শ্রীমান ব্যারি। লম্বায় পাঁচ ফুট আর চওড়ায় তিন ফুট, মুখখানি বুলডগের মত, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন

একটা প্রকাণ্ড কোলা ব্যাংকে কোট পাৎলুন পরিয়ে মাথায় টুপি দিয়ে সাহেব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

জেলে পৌঁছতেই উপেন্দ্রনাথের পৈতা কেড়ে নেওয়া হোল। আন্দামানের জেলখানা জগন্নাথ ক্ষেত্র, এখানে সবাই সমান—বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, পাঠান, সিন্ধী, বর্মী, মাদ্রাজী, সব মিশে খিচুরী পাকিয়ে গেছে। অপরাধের তারতম্য অনুসারে কোন শ্রেণীবিভাগ নেই। "কিসে জেলের আয় বৃদ্ধি হয়, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া চুণো-পুঁটি অফিসার পর্যন্ত সকলেরই সেই দিকে দৃষ্টি।....কঠোর বা লঘু পরিশ্রমের সঙ্গে সব সময় অপরাধের গুরুত্বের বা লঘুত্বের বড় একটা সম্বন্ধ থাকে না। যে সময় কোথাও নারিকেল ছোবড়ার তার (coir) পাঠাইবার দরকার হয় সে সময় সকলকেই ছোবড়া পিটিতে লাগাইয়া দেওয়া হয়, আর যখন নারিকেল বা সরিষার তেলের আবশ্যক হয় তখন একটু মোটাসোটা সকলকেই ধরিয়া ঘানি-গাছে জুড়িয়া দেওয়া হয়। সবটাই ব্যবসাদারী কাণ্ড!....কয়েদী মরুক আর বাঁচুক, কে তাহার খবর রাখে? ভারতবর্ষে লোকের অভাবও নাই আর মাসে মাসে জাহাজ বোঝাই করিয়া দরকারমত কয়েদী সরবরাহ করিবার জন্য বিলাতী বিচারকেরও অভাব নাই।

একবার একটি পাগলকে জেলখানায় দেখিয়াছিলাম। বেচারীর বাড়ী বর্ধমান জেলায়; জেলখানায় সে ঝাড়ুদারের কাজ করিত। তাহার নিজের বাড়ীর সম্বন্ধেও তাহার ধারণা অতি অস্পষ্ট; কেন যে সে সাজা পাইয়া কালাপানিতে আসিয়াছে তাহাও ভাল করিয়া বুঝিত না। একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা ক' ভাই?

সে উত্তর করিল—সাত।

তাহাদের নাম করিতে বলায় উত্তর দিল—ভুলে গেছি।

তাহার খাওয়া-পরার বড় একটা ঠিকানা থাকিত না; কখন আপন মনে

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; কখনও-বা সারাদিন রাস্তা পরিষ্কার করিয়া বেড়াইত। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে লোকটির মাথা খারাপ। তাহাকে পাগলা-গারদে না দিয়া কোন্ সুবিচারক যে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না। এরূপ দৃষ্টান্ত জেলখানায় অনেক পাওয়া যায়।....

বাস্তবিকই কয়েদীদের ভাল করিয়া তুলিবার চেষ্টা সেখানকার কর্তৃপক্ষদের মোটেই নাই বলিলে চলে। অসচ্চরিত্র লোকদিগের সচ্চরিত্র করিয়া তোলাতেই যে জেলখানার সার্থকতা, সে ধারণাও আছে বলিয়া মনে হয় না। কয়েদী তাঁহাদের কাছে কাজ করিবার যন্ত্র-বিশেষ, আর যে অফিসার কয়েদী ঠেঙ্গাইয়া যত বেশী কাজ আদায় করিতে পারে সে তত কাজের লোক; তাহার পদোন্নতি তত দ্রুত।"

বাঙ্গালা ভাষায় 'উঠতে লাথি বসতে ঝাঁটা' বলে যে একটা কথা আছে তার অর্থ যে কি, তা জেলখানায় দু'চার দিন থাকলেই বেশ বুঝতে পারা যায়।

এখানে কারও সঙ্গে কারও কথা বলার উপায় নেই।

আহারের ব্যবস্থা চক্ষু-চমৎকারী। "রেঙ্গুণ চালের ভাত ও মোটা মোটা রুটি....কচুর গোড়া, ডাঁটা ও পাতা, চুপড়ি আলু, খোসা সমেত কাঁচা কলা ও পুঁইশাক, ছোট কাঁকর আর ইন্দুরনাদি এক সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া যে পরম উপাদেয় ভোজ্য প্রস্তুত হয়, তরকারীর বদলে তাহা ব্যবহার করিতে গেলে চক্ষে জল না আসে, বাঙ্‌লা দেশে এমন ভদ্রলোকের ছেলে এ দুর্ভিক্ষের বৎসরেও বড় বিরল।"

এখানে কাজের ব্যবস্থাও চমৎকার। কালাপানিতে প্রচুর নারিকেল জন্মায়, সেইজন্য সেখানে প্রধানতঃ নারিকেল নিয়াই কারবার। "নারিকেলের ছোবড়া পিটিয়া তার বাহির করা ও তাহা হইতে দড়ি পাকান, শুষ্ক নারিকেল ও সরিষা ঘানিতে পিষিয়া তেল বাহির করা, নারিকেলের মালা হইতে হুকার

খোল প্রস্তুত করা—এ সমস্তই জেলখানার প্রধান কাজ। এ ভিন্ন এখানে বেতের কারখানাও আছে ; তাতে প্রধানতঃ অল্পবয়স্ক ছেলেরাই কাজ করে।”

ঘানি ঘুরানো ও ছোবড়া পেটাই সবচেয়ে কঠিন। সকালবেলা শৌচকর্মের পরে ‘কাঞ্জি’ গিলে ‘ল্যাঙ্গোটি’ এঁটে ছোবড়া পিটতে বসতে হয়। “প্রত্যেককে বিশটি নারিকেলের শুষ্ক ছোবড়া দেওয়া হয়। একখণ্ড কাঠের উপর এক একটি ছোবড়া রেখে একটি কাঠের মুগুর দিয়া তাহা পিটিতে পিটিতে ছোবড়াটি নরম হইয়া আসে। ছোবড়াগুলি পিটিয়া নরম হইলে তাহাদের উপরকার খোসা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। পিটিতে পিটিতে ভিতরকার ভুসি ঝরিয়া গিয়া কেবল মাত্র তারগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া পরিষ্কার করিয়া প্রত্যহ একসেরের একটি গোছা প্রস্তুত করিতে হয়।”

উপেন্দ্রনাথকে প্রথমে এই ছোবড়া পেটানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল। সারাদিন ছোবড়া পিটে হাতময় যখন ফোস্কা পড়ে গেল তখন মাত্র আধ পোয়া আঁশ বাহির হয়েছে। ওয়ার্ডার তো দাঁত খিঁচিয়ে আর গালাগালি দিয়ে বলতে কিছু বাকী রাখলো না, উপেনবাবু মুখ চূণ করে কুঠরীর মধ্যে বসে রইলেন। একজন পাঠান প্রহরী ছিল মানুষ ভাল, সে বললো—দেখ বাবু, আমি প্রায় পাঁচ বছর এই জেলে আছি। গালাগালি খেয়ে যারা মন গুমরে বসে থাকে তারা পাগল হয়ে যায় নয়তো মারামারি করে ফাঁসী যায়। ওসব মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল। খোদাতালার হুকুমে এমন দিন চিরকাল থাকবে না।

ঘানি ঘোরানোও ছোবড়া পেটার চেয়ে কম কঠিন কাজ নয়। এক একজন কয়েদীকে দৈনিক দশ পাউণ্ড সরিষারতেল বা ত্রিশ পাউণ্ড নারিকেল তেল তৈয়ারী করতে হয়। মোটা মোটা পালোয়ান লোকেরাও ঘানি ঘুরাতে ঘুরাতে হিমসীম খেয়ে যায়। উপেনবাবুকেও ঘানি টানতে হয়েছিল। প্রথম দিন তো আট দশ মিনিটের মধ্যেই দম বাহির হয়ে জিভ

শুকিয়ে গেল, এক ঘণ্টার মধ্যেই গা হাত পা যেন অড়ষ্ট হয়ে উঠলো। একবার মনে হোল, ডাক ছেড়ে কাঁদলে বুঝি-বা এ-জ্বালা মিটবে, কিন্তু লজ্জায় তা'ও পারলেন না। বেলা দশটার সময় যখন আহার করতে নেমে এলেন তখন হাতে ফোস্কা পড়েছে, চোখে সরিষার ফুল ফুটেছে আর কানে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। একদিনের কথা উপেনবাবু এখনও ভুলতে পারেননি। "সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘানি ঘুরাইয়াও ত্রিশ পাউণ্ড তেল পূরা করিতে পারিলাম না। হাত পা এমন অবশ হইয়া গিয়াছে যে মনে হইতেছিল বুঝি-বা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাই। তাহার উপর সমস্ত দিন প্রহরীদের কাছে কাজের জন্য গালি খাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলা আমাকে জেলারের নিকট লইয়া গেল। জেলার ত সুশ্রাব্য ভাষায় আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাদ্দেশে বেত লাগাইবার ভয় দেখাইলেন। ফিরিয়া আসিয়া যখন ভাত খাইতে বসিলাম তখন খাইব কি, দুঃখ ও অভিমানে পেট ফুলিয়া কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়াছে। এক জন হিন্দু প্রহরীর মনে একটু দয়া হইল; সে বলিল—'বাবুলোক তকলিফ্ মে হৈ, খানা জাস্তি দেও।' কথাগুলো শুনিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল। নিজের গলাটা নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলাম। এ সময় লাথি ঝাঁটা সহ্য করা যায়, কিন্তু সহানুভূতি সহ্য হয় না!"

রবিবারেও ছুটি ছিল না। নীচে থেকে জল তুলে দোতলা ও তেতলার বারান্দা নারিকেল ছোবড়া ঘষে পরিষ্কার করতে হোত।

একদিন উল্লাসকরকে কাছে পেয়ে উপেন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকেন, দুটো কথা বলার জন্য। পাঠান প্রহরী কাছেই ছিল, দুম করে পিঠে এক কিল বসিয়ে দিল, তারপর মারলো এক ঘুসি।

শেষে উপেন্দ্রনাথ একদিন বিদ্রোহ করলেন, সাফ জবাব দিলেন—আমি ঘানি পিষবো না, তুমি যা করতে পার করগে—!

জেলার ত অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। উপেনবাবুকে একটা কুঠরীতে বন্ধ করে

পর্যায়ক্রমে হাতকড়ি, বেড়ী ও কঞ্জির ব্যবস্থা হোল। শেষে শরীর যখন নিতান্তই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হোল তখন আবার তাঁকে ছোবড়া পিটতে দেওয়া হোল। "একদিন কুঠরীর মধ্যে পায়ে বেড়ী দিয়া শুষ্ক ছোবড়া পিটিতেছি। দারুণ গ্রীষ্মে ও কঠোর পরিশ্রমে মাথা হইতে পা পর্যন্ত ঘামের স্রোত ছুটিতেছে, ছোবড়া পিটিবার মুগুর মাঝে মাঝে লাফাইয়া লাফাইয়া আমারই মাথা ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কুঠরীর বাহিরে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান প্রহরীকে দেখিয়া ছোবড়াগুলো ভিজাইবার জন্য একটু জল চাহিলাম। সে একেবারে দাঁত মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল—না, না, হবে না, ঐ শুকনো ছোবড়াই পিটতে হবে।

আমারও মেজাজটা বড় সুবিধার ছিল না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—জল না হয় নাই দেবে, কিন্তু অত দন্তবিচ্ছেদ করছ কেন?

প্রহরী রুখিয়া দাঁড়াইল—কেয়া গোস্তাকি করতা?

বললাম—কেন? তুমি নবাবজাদা নাকি?

বলিবামাত্র প্রহরী জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার গলার হাঁসুলি ধরিয়া এমনি টান মারিল যে জানালার লোহার গরাদের উপর মাথা ঠুকিয়া গেল। রাগটা এত প্রচণ্ড হইয়া গেল যে লোকটা যদি কুঠরীর ভিতর থাকিত তাহা হইলে হয়তো তাহার মাথায় মুগুর বসাইয়া দিতাম।....শেষে তাহার হাত-খানা চাপিয়া ধরিয়া এমন কামড় বসাইয়া দিলাম যে তাহার হাত কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। হাত লইয়া সে জেলারের কাছে নালিশ করিতে ছুটিল।"

অত্যাচার যখন এক একবার চরমে উঠতো, তখন রাজনৈতিক কয়েদীরা ধর্মঘট করতেন—কর্তারাও রুদ্র হয়ে উঠতো, সাজার পর সাজা চলতো—চার দিন কঞ্জিভক্ষণ, সাতদিন দাঁড়া হাতকড়ি, তারপর কুঠরীতে বন্ধ করে তিন মাস পর্যন্ত নির্জন কারাবাস। কোন কোন কয়েদী সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতেন।

উপেনবাবুর দলের ইন্দুভূষণ মাঝে মাঝে বলতেন—'জীবনের দশটা বছর এই নরকে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।' একদিন রাত্রে নিজের জামা ছিঁড়ে দড়ি পাকিয়ে পিছনের ঘুলঘুলিতে লাগিয়ে তিনি ফাঁসী খেয়ে মরলেন। অসুস্থ দেহে অত্যাচার সইতে সইতে উল্লাসকর সহসা একদিন পাগল হয়ে গেলেন। যতীশচন্দ্র পালেরও সেই অবস্থা হোল।

এই সময় পুরাণো সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বদলী হয়ে নতুন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এলেন। তিনি উপেনবাবু প্রভৃতিকে জেলের বাহিরে সহজ কাজ দিলেন। জেলখানার বাহিরে কয়েদীদের কাজ মাটি কাটা, ইট বহা, ইট বানানো, রাজমিস্ত্রীর কাজ, কাঠ কাটা, নারিকেল গাছে পাহারা দেওয়া প্রভৃতি। উপেনবাবুকে নারিকেল গাছ পাহারা দিবার কাজে লাগানো হোল। পাঁচীলের বাহিরে এসে মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনটা একটু শান্ত হোল। কিন্তু বাহিরে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য আশা করেছিলেন তা পেলেন না। বাহিরে সকাল ছ'টা থেকে দশটা ও দুপুর একটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হোত। তার উপর উদয়-অস্ত রোদটা মাথার উপর দিয়ে যেত, বৃষ্টির সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হোত উন্মুক্ত আকাশের নীচে। আর সে বৃষ্টিও কি দু'-একদিন, আন্দামানে বৃষ্টি লেগে থাকে বছরে সাত মাস। তার উপর জলা-জঙ্গলে জোঁকের উপদ্রবও আছে যথেষ্ট।

এর উপর ছিল অন্নকষ্ট। কয়েদীর খোরাক চুরি করে বাজারে ও গাঁয়ে বিক্রী করা হোত, কয়েদীরা পেট ভরে খেতে পেত না। অধিকাংশ কর্মচারীই এই ব্যাপারে ঘুষ খেতো, কিছু বলতে গেলেই তাদের অত্যাচার সইতে হবে, তাই কয়েদীরা সব জেনে-শুনেও সহজে মুখ খুলতো না।

বাহিরে কয়েদীদের অসুখ করলেও শান্তি ছিল না। আন্দামানের জেল-হাসপাতাল মনুষ্যবাসের অযোগ্য। ছোট ছোট কুঠরী, বৃষ্টির সময় পিছন দিকের ঘুলঘুলি দিয়ে রীতিমত জল আসতো, কিন্তু গ্রীষ্মের দিনে এতটুকু বাতাস আসতো না। চিকিৎসা-তো অনেক পরের কথা।

উপেনবাবুরা শেষে আর সইতে না পেরে বার তিনেক ধর্মঘট করেন। ধর্মঘটের ফলে শাস্তি অনেক সইতে হোল বটে কিন্তু শেষে কর্তৃপক্ষ একটা রফা করতে বাধ্য হলেন। কয়েদীরা আট হাতি কাপড় ও হাতওয়ালা কুর্তা পরার অধিকার পেল, মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য পেল চার হাত লম্বা এক একখানি কাপড়। রেঁধে খাবারও অনুমতি পেল। খাটুনিও কমলো—বারীনবাবু হলেন বেতের কারখানার তত্ত্বাবধায়ক, হেমচন্দ্র হলেন পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ, উপেন্দ্রনাথ হলেন ঘানি-ঘরের মোড়ল। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকের মাসিক বেতন ধার্য হোল বারো আনা।

এই ভাবেই উপেনবাবুর জীবনের চৌদ্দটী বৎসর অতিবাহিত হোল।

প্রথম জার্মান যুদ্ধ শেষ হলে, কর্তাদের মতিগতি কিছুটা ভালোর দিকে গেল। দেশে আন্দামান-বন্দীদের নিয়ে খুব আলোড়ন হচ্ছিল, এক জেল-কমিটি গেল আন্দামানের অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য। তাদের রিপোর্ট পড়ে গভর্মেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের ফেরৎ পাঠাবার আদেশ দিলেন। খবর শুনেই কেউ ফুর্তিতে চীৎকার করতে লাগলো, কেউ বা খানিক হাত তুলে নাচলো, কেউ বা জুড়ে দিল গান।

শেষে উপেনবাবুদের জাহাজ এসে একদিন ভিড়লো খিদিরপুর ঘাটে। সেখান থেকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল ও মুক্তি।

বাড়ী যখন পৌছলেন তখন রাত তিনটে। চৌদ্দ বৎসর কালাপানিতে কাটিয়ে মানুষ যে আবার ফিরে আসতে পারে সেকথা বাড়ীর লোকেরা সহসা বিশ্বাস করতে পারে নাই!

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর—

'জেলে ত্রিশ বছর'

এক

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ।

১৯০৮ সালে নারায়ণগঞ্জের এক নৌকায় একটী ছেলে ধরা পড়লো। পুলিশ তাঁকে চিনতে পারলো যে সে অনুশীলন-সমিতির একজন প্রধান সংগঠক—ত্রৈলোক্যনাথ। কয়েক মাস তাঁকে হাজতে রেখে, তারপর নৌকাচুরির অভিযোগে তাঁকে পাঁচ মাস জেলে পাঠালো। সশ্রম কারাদণ্ড। মাত্র এক ঘণ্টা নারায়ণগঞ্জের জেলে গম পিষতে হোল, তারপর ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে দেওয়া হোল ঘানি টানতে। প্রথমে মাথা ঘুরতো, তৃষ্ণা পেতো, তারপর সব সহে গেল।

তখনকার জেল সম্পর্কে ত্রৈলোক্যবাবু লিখেছেন—"জেল তিনটি জিনিষের জন্য বিখ্যাত—ফাইল, গাইল, ডাইল—জেলখানায় দিনের মধ্যে বহুবার গুণতি হয়, ফাইল করিয়া জোড়া জোড়া বসিতে হয়, জোড়া জোড়া চলিতে হয়, বে-ফাইলে পা বাড়াইলেই বিপদ। পাইখানা যাওয়া, স্নান করা, খাওয়া,—সবই ফাইল অনুসারে। দেরী করিবার উপায় নাই। 'সরকার' বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইতে হইবে, নতুবা রক্ষা নাই। 'গাইল' (গালি) জেল কর্মচারীদের মুখে লাগিয়াই আছে, সম্বোধন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সম্পর্ক পাতান চাইই। জেলখানায় খাইবার মধ্যে 'ডাইল'। কারণ, ধান ও পাথরের জন্য ভাত খাওয়া যায় না, তরকারীও খাইতে প্রবৃত্তি হয় না। একমাত্র 'ডাইল'ই সম্বল।....

আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন সপ্তাহে ছয় দিনই কলায়ের ডাল দেওয়া হইত।....প্রত্যহ কলায়ের ডাল দেওয়ার একটা ইতিহাস পুরাণো কয়েদীদের নিকট শুনিলাম। তাহারা বলিল—পূর্বে এক একদিন এক একরকম ডাল দেওয়া হইত। একবার জেলের আই. জি. জেল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। কয়েদীরা তাঁহার নিকট মাছ খাইবার প্রার্থনা জানাইল।....আই. জি. বাংলা জানিতেন না। জেলার বাবু তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাহারা মাসকলায়ের ডাল খাইতে চায়। আই. জি. জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ ডাল কি খুব দামী?' জেলার-বাবু উত্তর করিলেন—'দাম খুব বেশী নয়।' আই. জি. হুকুম দিলেন—'খুব মাস দাও!' তখন হইতে মুসুরী ও ছোলার ডাল উঠিয়া গেল—তাহাদের স্থান অধিকার করিল এই মাসকলায়ের ডাল।....

....জেলে আমি যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। জেলের অন্তরালে আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিলাম। এখানে অতীতের কথা যখন মনে পড়িয়াছে তখন ভাবিয়াছি কি ছেলেমানুষই না আমি ছিলাম।"

১৯০৯ সালের প্রথম ভাগে তিনি মুক্তি পেলেন।

দুই

১৯১৪ সালে কলিকাতায় ত্রৈলোক্যবাবুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলো। লালবাজার থেকে হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দুকধারী সিপাহীর পাহারায় তাঁকে পাঠানো হোল বরিশাল। ষড়যন্ত্র মামলা। এক বছর এই মামলা চললো। সাজা হোল—পনেরো বছর দ্বীপান্তর বাস। তারপর—

"আদালত হইতে জেলে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ে শিকলি-বেড়ি পরাইয়া দিল—কারণ আমাদের সাজা বেশী। কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা বরিশাল হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে চালান হইলাম।....প্রেসিডেন্সী জেলে

যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শিকলি-বেড়ি কাটিয়া ডাণ্ডা-বেড়ি পরাইয়া দিল এবং ৪৪ ডিগ্রীতে বন্ধ করিল।....৪৪ ডিগ্রীকে নির্জন কারাবাস বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র সেলের মধ্যে সমস্ত দিনরাত্র আবদ্ধ থাকিতে হইত—কাহারও সহিত দেখা হইত না বা কাহারও সহিত কথা বলিবার উপায় ছিল না, দিনের মধ্যে একবার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিয়া দেখিয়া যাইতেন মাত্র। আমাদিগকে চট সেলাইএর কাজ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা পাশাপাশি সেলে থাকিয়াও পরস্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। কথা কহিবার জন্য আমাদের মাঝে মাঝে হাতকড়া সাজা হইয়াছে।

আমাদের ভাতের মধ্যে ধান ও পাথর কোন্‌টা বেশী ছিল বলা কঠিন। একদিন আমি কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম—

জেলার বেটা বড় খচ্চর
খেতে দেয় ধান আর পাথর....।

তখন শীতকাল ছিল। আমি হাঁপানির রোগী কিন্তু একখানা অতিরিক্ত কম্বল চাহিয়াও পাইলাম না। তাই আবার কবিতা লিখিলাম—

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বড় পাজীর পাজী
বেশী কম্বল দিতে হয় না রাজী—।

লিখিবার জন্য আমাদের কাগজ কলম কিছু ছিল না—মুখে মুখেই কবিতা তৈয়ারী করিতে হইত এবং পরে চীৎকার করিয়া পরস্পরকে শুনাইতাম।.... কয়েক মাস আমাদের জাল-ডিগ্রীতেও কাটাইতে হইয়াছিল।"....

তারপর আন্দামানে যাবার পালা। ত্রৈলোক্যবাবু হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁকে আন্দামানে পাঠানো চলে কিনা মেডিক্যাল-বোর্ডের ডাক্তাররা পরীক্ষা করলেন, তারপর তাঁর টিকিটে লিখে দিলেন—'হাঁপানিতে ভুগছে। সমুদ্র-যাত্রার মত স্বাস্থ্য আছে।'

দ্বীপান্তর যাবার কথায় মনটা খারাপ হয়ে গেল, দেহের যা অবস্থা হয়তো

আর ফিরে আসা হবে না। কারও সঙ্গে দেখা হোল না, জানা-চেনা আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে দুটো কথা বলে যাওয়া হোল না। মনের দুঃখে দেয়ালে সুরকী দিয়ে কবিতা লিখলেন—

বিদায় দে'মা প্রফুল্ল মনে
আমি যাই আন্দামানে
এই প্রার্থনা করি মা গো
মনে যেন রেখো সন্তানে।
আবার আসিব ভারত জননী মাতিব সেবায়
তোমার বন্ধন মোচনে মা গো যেন এ প্রাণ যায়।
বিদায় ভারতবাসী, বিদায় বন্ধুবান্ধবগণ,
বিদায় পুষ্পতরুলতা, বিদায় পশুপাখীগণ!
ক্ষমো সবে যত করেছি অপরাধ
জ্ঞানে অজ্ঞানে,
বিদায় দে' মা প্রফুল্ল মনে
যাই আমি আন্দামানে।

যাবার সময় জেলার সাহেব বললো—তুমি সেখানেই মরবে।

তিন দিন তিন রাত জাহাজে কাটিয়ে চতুর্থ দিন বেলা দশটার সময় কয়েদীরা পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছলেন।

"স্থান হিসাবে আন্দামান অস্বাস্থ্যকর হইলেও ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব সুন্দর। সমুদ্রের মধ্যে পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর সেলুলার জেল। জেলের তেতলা হইতে সমুদ্র এবং পাহাড়ের দৃশ্য মনোরম দেখা যাইত। সেলুলার জেলে সাত শত কয়েদী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সাত শত সেল আছে। আন্দামানে ছোটবড় প্রায় দুই শত দ্বীপ আছে। সাধারণ কয়েদীদিগকে

সেলুলার জেলে তিন মাস হইতে দুই বৎসর রাখা হয়, পরে বিভিন্ন দ্বীপ বা টাপুতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেখানেও তাহাদিগকে কয়েদীর মতই থাকিতে হয়, সরকারী কাজ করিতে হয় এবং সরকার হইতে তাহারা আহার্য পায়। তবে সেখানে তাহারা জেল হইতে কিছু বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে।....১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের পর এত লোক দণ্ডিত হইয়াছিল যে ভারতীয় জেলে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হয় নাই। তাই সরকার তাহাদিগকে আন্দামান পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। আন্দামান তখন আরো অস্বাস্থ্যকর ছিল। বর্তমানে আন্দামানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সহর দেখা যায়। এই সহর সেই রাজনৈতিক কয়েদীদের মৃত স্তূপ হইতে সৃষ্টি। হতভাগ্য কয়েদীরা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, ম্যালেরিয়া ডিসেণ্ট্রির সহিত লড়াই করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহরগুলির পত্তন করে। তখন আন্দামানের অবস্থা এরূপ ছিল যে কেহ আর দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিত না, কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে তাহাদের জীবন-দীপ নিভিয়া যাইত

সেলুলার জেলে পৌছাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পায়ের বেড়ী কাটিয়া দিল। মনে হইল পা খুব হাল্কা হইয়া গিয়াছে—চলিতে ভয় ভয় লাগে! কিছু-ক্ষণ পর খুব তল্লাসী সুরু হইল—কেহ যদি টাকা পয়সা সঙ্গে লইয়া আসে। আন্দামানে পৈতা রাখিবার হুকুম ছিল না, তল্লাসী করিয়া আমাদের গলা হইতে পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল।....

আন্দামানে জেলার ও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন সর্বেসর্বা।....

আন্দামানের প্রত্যেকটি কয়েদী বছরে একখানি চিঠি বাড়ীতে লিখিতে পাইত ও একখানি চিঠি বাড়ী হইতে পাইতে পারিত।....

আন্দামান জেলের খাওয়া দেশের জেল হইতে অনেক খারাপ। সস্তা রেংগুন আতপ চালের ভাত, সারা বৎসর দুইবেলা আড়হর ডাল এবং অখাদ্য ঘাস-পাতার তরকারী—ইহাই ছিল নিত্যাকার খাদ্য। রাত্রে জেলে কোন আলোর

ব্যবস্থা ছিল না, পাইখানার ব্যবস্থাও ছিল অদ্ভুত। রাত্রে প্রত্যেকের সেলে একটি করিয়া মাটির ঘট দেওয়া হইত, এক সেরের বেশী তাহাতে জল ধরিত না। সেই ঘটেই মলমূত্র ত্যাগ করিতে হইত।"

ত্রৈলোক্যবাবুকে নারিকেলের ছোবড়া পিটতে দেওয়া হোল। কঠিন কাজ, তিনি বললেন—আমার হাঁপানি আছে!

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললো—মনে রেখো এটা আন্দামান।

অসুস্থ দেহে কাজ করতে করতে একদিন হাঁপানির টান এতো বেড়ে গেল যে এখনই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে। ক'জন ধরা-ধরি করে তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দিল। কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁকে হাসপাতালে রাখলো না, পরদিনই তাঁকে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দিল, বললো—দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিলে তা' মনে নেই? এখন দুধ খেতে এসেছ?

আন্দামানে সাতটি ইয়ার্ড আছে, ইহাদের এক ইয়ার্ড থেকে অন্য ইয়ার্ডে যাবার হুকুম নাই। রাজনৈতিক কয়েদীদেরকে এই সাত ইয়ার্ডে ভাগ করে রাখা হয়েছিল।....

"আন্দামানের সরকারী বিবরণ হইতে জানা যাইবে যে সেলুলার জেলে গড়ে প্রতি মাসে তিনটি করিয়া লোক আত্মহত্যা করিয়াছে।"....

ত্রৈলোক্যবাবু সারারাত কাশতেন। শরীর অতি দুর্বল। মাঝে মাঝে মনে হোত এইখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে হবে।

কিন্তু মরতেই যখন হবে তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মরাই ভালো। ত্রৈলোক্যবাবু আইন-অমান্যকারীর দলে গিয়ে পড়লেন। দলের অমর সিং একদিন তো জেলারকে মুখোমুখি গালি দিলেন। জেলার গালিগালাজ করায় পণ্ডিত পরমানন্দ একদিন জেলারকে লাথি ও ঘুসি মারলেন। পরে সে জন্য তাঁকে কুড়ি ঘা বেত খেতে হোল। একদিন সর্দার ভানসিংকে জমীদাররা এমন মারলো যে তাঁর জীবনের আশা আর রহিল না। কথাটা জানাজানি হওয়ামাত্রই সত্তর

জন কয়েদী অনশন সুরু করলেন। ত্রৈলোক্যবাবুও তাঁদের মধ্যে একজন। এর জন্য প্রত্যেকের ৬ মাস ডাণ্ডাবেড়ী, ৬ মাস সেল, সাতদিন খাড়া হাতকড়ি সাজা হোল। চীফ্ কমিশনার জেল দেখতে এলেন। ত্রৈলোক্যবাবুকে ধমক দিয়ে বললেন—তোমরা গণ্ডগোল করছ কেন?

—ভানসিংকে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়েছে।

—না, ভানসিংকে প্রহার করা হয়নি।

—ভানসিং মৃত্যুশয্যাশায়ী, আপনি ইচ্ছা করলে তাঁকে দেখে আসতে পারেন।

—বেশ, যদি তাকে মেরেই থাকে তাতে তোমার কি? সে তো তোমার চাচাও নয়, নানাও নয়।

—সে আমার সহকর্মী, আমার বন্ধু।

—তোমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?

—আমি হাঁপানিতে ভুগছি, আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সে জন্য ডাক্তারকে ধমক দেয়।

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়ি বললো—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। সেদিন সে সুস্থ ছিল।

ত্রৈলোক্যবাবু তাঁর টিকিট দেখালেন, বললেন—সে দিন আমাকে হাসপাতালে বহে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আর পরদিনেই আমি সম্পূর্ণ নিরোগ হয়ে গেলাম, আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো!

—এসব তোমার 'বাহানা'—বলে চীফ-কমিশনার চলে গেলেন।

তারপর যে ক'জন কয়েদীর সঙ্গে তাঁর দেখা হোল, সেই তাকে মুখোমুখি অপমান করলো।

জেলে ঘুষ দিয়ে সবই পাওয়া যায়। ঘুষের মধ্যে সবচেয়ে লোভনীয় হচ্ছে বিড়ী, তামাকপাতা প্রভৃতি। একবার দু'খানি তামাকপাতা ঘুষ দিয়ে ঘানি-ঘর

থেকে ত্রৈলোক্যবাবু একসের সরিষার তেল জোগাড় করলেন। কিন্তু তেল নিয়ে যাবার সময় মালশুদ্ধ ধরা পড়ে গেলেন টিণ্ডেলের কাছে। গালিগালাজ চলছে, এমন সময় কাছে এসে দাঁড়ালেন পাঞ্জাবী কয়েদী শেরসিং, জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে ?

টিণ্ডেল বললো—এই বাঙালী তেল চুরি করেছে।

—তাই নাকি ? দেখি কতটুকু তেল !

টিণ্ডেলের হাত থেকে তেলের বাটীটা নিয়ে তিনি এক চুমুকে শেষ করে দিলেন, বললেন—লে শালা !

টিণ্ডেল দেখলো মাল নেই, কেউ সাক্ষ্যও দেবে না, সে রাগে গর্ গর্ করতে করতে চলে গেল।

শের সিং ছিলেন প্রকাণ্ড জোয়ান। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের রাজনৈতিক কয়েদী। একবার দশ সের দুধের এক বালতি তিনি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। কয়েদীরা তাঁকে ডাকতো হাতী-ভাই বলে।

আন্দামানের সেলগুলি আট হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া। কয়েদীদেরকে সারাদিন তারই মধ্যে থাকতে হোত। দিনের বেলায় সেলে বিছানা রাখার হুকুম ছিল না, সন্ধ্যাবেলা বিছানা দিয়ে যেত। অনেক কয়েদী সেলে বসে বসে কবিতা লিখতেন। ত্রৈলোক্যবাবু বলেছেন—'যা খুসী ও যে ভাবে খুসী আমরা কবিতা রচনা করিতাম।....কবিতা লেখার জন্য আমাদের কাগজ কলম ছিল না, কাগজ কলমের প্রয়োজনও হইত না। আমাদের সম্বল ছিল সেলের মাঝে দেওয়াল ও সুরকী।....অধিকাংশই পাঞ্জাবী, তাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন না। তাই আমি স্থির করিলাম ইংরাজিতে কবিতা লিখিব।....প্রথম কবিতা লিখিলাম ঃ

Murray the Superintendent is a
First class scoundrel,

Unwilling to keep the sickmen
In the hospital.
For nothing he abuses,
Punishes the prisoner—
What shall I say.
Of his brutal behaviour.

এইরূপ বেপরোয়াভাবে আমরা কবিতা লিখিতে লাগিলাম এবং খাইবার সময় পরস্পরের কবিতা শুনিতাম।"

পাঞ্জাব মার্শাল-ল'-কেসের কয়েক জন কয়েদী এলো, তারা ঘানি টানবে না, ঘানি-ঘরে শুয়ে পড়লো। জেলারের আদেশে তাদের হাত-পা বেঁধে ঘানির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোল। ঘানির চারিদিকে তারা হিঁচড়ে হিঁচড়ে ঘুরতে লাগলো, তাদের পিঠ ও হাত-পায়ের চামড়া উঠে গেল। সারা জেলের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে সামনে পেয়ে একদিন ত্রৈলোক্যবাবু বললেন—আপনাকে জিজ্ঞাসা করি মার্শাল-ল'-বন্দীদের উপর এরূপ অত্যাচার করা হোল কেন?

তার উত্তর হোল—চুপ রও শুয়ার কা বাচ্চা।

ত্রৈলোক্যবাবুও চেঁচিয়ে উঠলেন—তুম চুপ রও কুত্তিকা বাচ্চা।

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাড়াতাড়ি চলে গেল। ত্রৈলোক্যবাবুর সাজা হোল চার দিন পেনাল ডায়েট—অর্থাৎ দু'বেলায় মাত্র আধ সের ভাতের ফেন।

কিন্তু খাবার যারা দেবে তারা যখন শুনলো ত্রৈলোক্যবাবু সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে গালি দিয়েছেন, তখন বললো—বাঙালী শের হায়, ডবল খানা দাও!

এলো চাট্‌নি আর রুটি।

ত্রৈলোক্যবাবু লিখেছেন—"বেত ছাড়া, সমস্ত রকম সাজা আমার হইয়াছে। ক্রস-বার-ফেটার্স, ডাণ্ডাবেড়ি, শিকলি-বেড়ি, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি,

রাত্রে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেল্‌-বাস প্রভৃতি সমস্ত সাজা আমি ভোগ করিয়াছি।....বেড়ী পায়ে দিতে দিতে আমার পায়ে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় পড়িয়াছিলাম যে, বেড়ী পায়ে দিয়া আমরা দৌড়াইতে পারিতাম। মাঝে মাঝে কম্বলের কোর্তাকে ফুটবল বানাইয়াও বেড়ি পায়ে দিয়া খেলিয়াছি। আমরা সময় সময় ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু তর্ক করিয়াছি—ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে কিরূপ গভর্মেণ্ট হইবে, রাজধানী কোথায় থাকিবে, রাষ্ট্রভাষা কি হইবে ইত্যাদি।”

পরে ত্রৈলোক্যবাবু জেল-কমিশনের কাছে জেলের উন্নতির জন্য কয়েকটী প্রস্তাব করেছিলেন ঃ

পেনাল সেট্‌ল্‌মেণ্ট উঠিয়ে দিতে হবে।

দেশের জেলের মত তিন মাস অন্তর চিঠি লেখার অনুমতি দিতে হবে।

পৈতা ও ধর্মের চিহ্ন রাখতে দিতে হবে।

ফাঁসী উঠিয়ে দিতে হবে।

কয়েদীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

ত্রৈলোক্যবাবুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব জেল-কমিশন মেনে নিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২১-সালে প্রথম প্রস্তাবটীও স্বীকৃত হয় এবং ত্রৈলোক্য বাবুকে আলীপুর জেলে ফেরৎ আনা হয়।

আলিপুর বম্ ইয়ার্ড।

ভারতব্যাপী তখন আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হয়েছে, বাংলার সমস্ত বড় বড় নেতা তখন আলীপুর জেলে কারারুদ্ধ। আর তাঁদের সঙ্গে ছিলেন প্রায় ৬০০ সত্যাগ্রহী। জেলখানা জনপূর্ণ। নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি আর চালানো যায় না, যুবকের দল বম্ ইয়ার্ডের পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে এসে ঢোকে। শেষে আর রুখতে পারলো না জেলের কর্তারা, সবাইকে মেলামেশা করবার অবাধ

সুযোগ দিতে বাধ্য হলেন। নেতাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিপ্লবীরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভক্ত হয়ে উঠলেন। দেশবন্ধু একদিন ত্রৈলোক্যবাবুকে নিমন্ত্রণ করে পাশে বসে খাওয়ালেন, সুভাষবাবু পরিবেশন করলেন। তা ছাড়া নেতাদের বাড়ী থেকে যে-সমস্ত খাবার আসতো—কলা, কমলা, রসগোল্লা প্রভৃতির ভাগ আসতে লাগলো নিয়মিত। বিপ্লবীরা সাত আট বছর জেলের বাহিরে কোন খাবার খাননি, আবার নতুন করে তার স্বাদ পেতে লাগলেন।

ওদিকে সত্যাগ্রহী যুবকদের দল ক্রমশঃ বিপ্লবীদের বাধ্য হয়ে পড়লেন। তাই দেখে কেউ কেউ দেশবন্ধুর কাছে অভিযোগ করলো—বম্ ইয়ার্ডের লোকেরা হিংসার কথা বলে ছেলেদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে!

দেশবন্ধু তার উত্তরে বললেন—ওঁদের কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়!

ইতিমধ্যে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করে ত্রৈলোক্যবাবু নতুন ধরণের পাঁচখানি বই লেখেন—প্রথম ভাগ থেকে পঞ্চম ভাগ। দেশবন্ধু খবর পেয়েই একদিন বললেন—আমার একটী প্রাইমারী এডুকেশন স্কীম্ আছে, খাতাগুলি তুমি আমাকে দাও!

দাশসাহেব কারামুক্তির সময় খাতাগুলি সঙ্গে নিয়ে যান।

আলাপ-আলোচনার মধ্যে কয়েকটি মাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। সত্যাগ্রহীরা একে একে বাহির হয়ে গেলেন। বিপ্লবীরা জেলেই রয়ে গেলেন। মনের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো। সেই নিরানন্দকে জয় করার জন্য ত্রৈলোক্যবাবু গীতার ভাষ্য লিখতে সুরু করলেন। তিনি গীতার মধ্যে নতুন আদর্শের সন্ধান পেয়েছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শ্রবণ করিয়া অর্জুন জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্বক কোন নির্জন পাহাড়ের উপর যাইয়া ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, অথবা ভক্তিমার্গ অবলম্বন পূর্বক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রেম বিতরণ করেন

নাই,—তিনি যুদ্ধ করিয়াই পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন—আমার নিকট ইহাই গীতার সারমর্ম।” সেই মর্মকথাই তিনি লিখতে সুরু করলেন। চারি অধ্যায় লেখা যখন শেষ হয়েছে সেই সময় ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে তিনি মুক্তি পেলেন।

তিন

দশ মাস বাদে ত্রৈলোক্যবাবু আবার ধরা পড়লেন।

ময়মনসিং থেকে মেদিনীপুর, তারপর আলীপুর জেল, সেখান থেকে মান্দালয়।

মান্দালয়ে ত্রৈলোক্যবাবুর সহযাত্রী ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। জেলে পৌঁছে সুভাষবাবু বললেন—মহারাজের (ত্রৈলোক্যবাবুর ডাকনাম) সীট আমার পাশে থাকবে।

মান্দালয় জেলে খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল। ত্রৈলোক্যবাবু এবার আর সাধারণ কয়েদী ছিলেন না, এবার তিনি ‘ষ্টেট্-প্রিজ্‌নার’। একবার টেনিস খেলতে খেলতে হঠাৎ তিনি পড়ে যান। তাতে হাঁটুর চামড়া উঠে যায় ও ঘা হয়। সুভাষবাবু প্রতিদিন নিজহাতে নিমপাতা-সিদ্ধ জল দিয়ে সেই ঘা ধুইয়ে দিতেন।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুভাষবাবুর ব্যবহারে ত্রৈলোক্যবাবু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

মান্দালয় জেলে দুর্গোৎসব করার কথা ওঠে, কিন্তু গবর্মেণ্ট সেজন্য টাকা দিতে চান না। রাজবন্দীরা তখন অনশন সুরু করেন। চৌদ্দ দিন অনশন করার পর সরকার শেষ অবধি রাজবন্দীদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মান্দালয় থেকে ত্রৈলোক্যবাবুকে ইনসিন ও মিঙ্গান জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে লোম্যান সাহেব ও ইনস্‌পেক্টার দত্ত ত্রৈলোক্যবাবুর মত বদলাবার

চেষ্টা করেন। লোভ দেখান যে মত বদলালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে কিন্তু ত্রৈলোক্যবাবু অটল। শেষে তাঁকে ফিরিয়ে এনে নোয়াখালি জেলার হাতিয়া দ্বীপে অন্তরীণ করে রাখলেন। ১৯২৮ সালে ত্রৈলোক্যবাবুকে মুক্তি দেওয়া হোল।

চার

১৯৩০ সালে রাজসাহীতে এক রাজনৈতিক কর্মী-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যবাবু রাজসাহীতে গ্রেপ্তার হলেন। তিন-আইনে তাঁকে আটকে রাখা হোল। রাজসাহী, বহরমপুর, বাক্‌সা ক্যাম্প, ভেলোর, কেনান্নুর, ত্রিচিনপল্লী, হিজলী ও প্রেসিডেন্সি জেলে আট বছর ধরে ঘোরানো হয়, পরে ১৯৩৮ সালে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কেনান্নুর জেলে কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য ত্রৈলোক্যবাবু সতেরো দিন অনশন করেন। ওখানকার জেলার লোক ভাল ছিল না, আইন অমান্য করে যাঁরা জেলে এসেছিলেন তাঁদের ওপর দু'বার লাঠি চার্জ করা হয়। ত্রৈলোক্যবাবু একখানি করে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা পেতেন, তা বন্ধ করে দেওয়া হোল। ত্রৈলোক্যবাবু ভারত সরকারের কাছে এক দরখাস্ত লিখলেন, তাতে জেলার জেলের মধ্যে যে সব অত্যাচার করেছিল তাও লিখলেন। দরখাস্ত জেলারের মারফৎ যাবে। জেলার চিঠিখানি হাতে পেয়েই ত্রৈলোক্যবাবুকে ডেকে পাঠালো ও তিরস্কার করলো। ত্রৈলোক্যবাবু-ও তার কড়া জবাব দিলেন, বললেন—আমি তিন-আইনে বন্দী, আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে আমাকে একটা বসবার চেয়ার দিতে আপনি বাধ্য।

জেলার বললো—তুমি ইচ্ছা করলে বসতে পার।

—দরকার নেই!—বলে ত্রৈলোক্যবাবু চলে এলেন।

ফিরে এসেই ভারত সরকারের কাছে আরেক দরখাস্ত লিখলেন—'সঞ্জীবনী'

পত্রিকা না দেওয়ার জন্য ও জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের জন্য আমি অনশন সুরু করলাম!

জেলার এবার ছুটে এলো, বললো—আপনি 'সঞ্জীবনী' নিন্ কিন্তু অনশন করবেন না।

ত্রৈলোক্যবাবু কিন্তু অটল।

বেসরকারী পরিদর্শক এলেন জেলে, ত্রৈলোক্যবাবুর সব কথা শুনে তিনি বললেন—আপনি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের আপিস-ঘরে ছাতা খুলে ঢুকেছিলেন, কাজটা ভদ্রতা-বিরুদ্ধ হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যবাবু বললেন—আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে যে আপিস ঘরে ছাতা খুলে প্রবেশ করবো? কেউ ছাতা খুলে দোতলায় ওঠে নাকি? আপিস-ঘরে ঢোকার আগে আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে ঢুকেছি।

তারপর এলেন জজ সাহেব এবং ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁরা সব শুনে জেল-সুপারের মিথ্যা কথাই বিশ্বাস করে রিপোর্ট দিলেন—ত্রৈলোক্যবাবুই দোষী, তিনি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের ঘরে ছাতা খুলে ঢুকেছিলেন, তাঁকে ছাতাটি বাইরে রাখতে বললে তিনি সুপারকে অপমান করেন!

সাহেব-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের মিথ্যা কথাই সরকার সত্য বলে গ্রহণ করলেন, ত্রৈলোক্যবাবুরও অনশন চলতে লাগলো। সারাদিনে তিনি শুধু তিন-চার গ্লাস জল খেতেন, আর একবার স্নান করতেন।

পনেরো-ষোল দিন এইভাবে চলার পর সাহেব মেডিক্যাল-অফিসার এসে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—কি হলে আপনি অনশন ত্যাগ করতে পারেন?

ত্রৈলোক্যবাবু বললেন—কংগ্রেসী লোকদের উপর যদি অত্যাচার বন্ধ হয় এবং তাদের খাবার ব্যবস্থা যদি ভালো হয়—অর্থাৎ, জেল কর্তৃপক্ষ যদি চুরি না করে তবেই আমি অনশন ভঙ্গ করতে পারি।

মেডিক্যাল-অফিসার সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিশ্রুতি দিলেন—বেশ তাই হবে!

ত্রৈলোক্যবাবু তাঁর অনশন ভঙ্গ করলেন।

ভেলোর জেলে একটি বানর ধরে ত্রৈলোক্যবাবু কিছুদিন পুষেছিলেন।

এই সময় তিনি কারাগারের কি করে উন্নতি করা যায় সেই সম্পর্কে একখানি বই লেখেন। বইখানি রামানন্দবাবু 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য নেন, পরে তাঁর মৃত্যু ঘটায় তা আর প্রকাশিত হয়নি।

মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির চেষ্টায় যখন জেলে গিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন তখন ত্রৈলোক্যবাবুর সঙ্গেও তিনি দু'বার দেখা করেন এবং রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে প্রায় দু'ঘণ্টা আলোচনা করেন!

ত্রৈলোক্যবাবু এই সময় সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং স্থির করেন যে জেল থেকে বাহির হয়ে তিনি একটা সোস্যালিষ্ট পার্টি দাঁড় করাবেন।

পাঁচ

১৯৩৮য়ের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪০য়ের মার্চ।

এই দেড় বছর ত্রৈলোক্যবাবু জেলের বাহিরে ছিলেন এবং সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়ে বামপন্থীদের সংগঠন করতে আত্মনিয়োগ করেন।

মার্চ মাসে চট্টগ্রামের এক সভায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছ' বছর তাঁকে হিজলী, ঢাকা ও দমদম সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। এই সময় ঢাকা জেলে এক লোমহর্ষণ দুর্ব্যবহার তিনি প্রত্যক্ষ করেন। সেই সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঃ

"'জেলের ইতিহাসে, পৃথিবীর কোন স্থানে, ফ্যাসিষ্ট বন্দী-শিবির—কোথাও সম্ভবতঃ এরূপ বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে নাই। ঢাকা জেলে প্রায় তিন শত গুণ্ডা সিকিউরিটি বন্দী ছিল। তাহাদিগকে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। গুণ্ডা সিকিউরিটি বন্দীরা বিনা বিচারে আটক থাকার জন্য

কোনই বিশেষ সুবিধা পাইত না, তাহাদিগকে কাজ করিতে হইত এবং তাহারা সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার পাইত। পুরাতন জেল কর্মচারীদের মনোবৃত্তি, সর্বদা অপরাধীদের সহিত থাকার জন্য ক্রিমিন্যাল হয়। তাহারা হয় হৃদয়হীন, মায়া-দয়া তাহাদের কিছুই থাকে না। সাধারণ কয়েদীদের সমর্থন করার কেহ থাকে না, তাই জেল কর্মচারিগণ তাহাদের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করে। ঢাকা জেলের গুণ্ডা কয়েদীরা জেল কর্তৃপক্ষের নিকট কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা চাহিয়াছিল। তাহারা বলিয়াছিল, তাহারা কয়েদী নয়, বিনা বিচারে আটক আছে, তাহাদের ভাল খাওয়া ও বিড়ির ব্যবস্থা না করিলে তাহারা কাজ করিবে না। তাহাদের এই দাবী জেল কর্তৃপক্ষের সহ্য হইল না।

গুণ্ডা সিকিউরিটি বন্দীদের এক ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পরদিন প্রাতে তাহাদের কয়েকজন প্রতিনিধি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট তাহাদের অভিযোগ নিবেদন করার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাদিগকে সুপারের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইল, সুপার তাহাদিগকে ধমকাইলেন, গালি দিলেন, সুপারের সহিত তাহাদের বচসা হইল, শ্বেতাঙ্গ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কৃষ্ণকায় কয়েদীদের অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া সেখানেই কয়েকজনকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এই ঘটনায় অন্যান্য কয়েদীরা উত্তেজিত হইয়া ঢিল ছুঁড়িতে লাগিল। এই ঘটনায় সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব বন্দুকসহ সদলবলে উপস্থিত হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আদেশ দিলেন। হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। এই হত্যাকাণ্ডের সময় অনেকে প্রাণভয়ে গাছের উপর উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হইল; অনেকে পায়খানায় লুকাইল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা করিল; কেহ কেহ তাহাদের ইয়ার্ডের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অপর ইয়ার্ডে লাফাইয়া পড়িল, সেখানে জেলের কয়েদী মেট পাহারা তাহাদের লাঠি দ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করিল। প্রায় ৫০ জন লোক হত হইল, সকলেই আহত হইল, অক্ষত কেহ ছিল না।....

....এই হত্যাকাণ্ডের পর জেল কর্তৃপক্ষ মোটেই অনুতপ্ত হন নাই, বরং ইহাকেই মূলধন করিয়া আরও লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে, তাঁহাদের পদোন্নতি ও উপাধি লাভ হইয়াছে।....শেষ পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধীদের কোন শাস্তি হয় নাই।"

ত্রৈলোক্যবাবু ত্রিশ বছর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী ছিলেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"আমি ভারতবর্ষের মধ্যে, ভারতবর্ষ কেন সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে, রাজনৈতিক কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক বৎসর যাঁহারা কারাগারে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম! আমি ১৯০৮ সন হইতে এ পর্যন্ত ৩০ বৎসর কারাগারে কাটাইয়াছি, ৪।৫ বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইয়াছি; ১৯১৬-১৭ সনে আন্দামানে বারিনবাবু, পুলিনবাবু, সাভারকর ভ্রাতৃদ্বয়, ভাই পরমানন্দ, জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, গুরুমুখ সিং, পরমানন্দ, মোস্তাফা আমেদ প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। ১৯২৫-২৬ সনে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয় জেলে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাটাইয়াছি, ১৯৩২-৩৩ সনে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলে কে. রামন. মেনন, কর্ণাটকের সদাশিব রাও, অধ্যাপক এন. পি. নারায়ণ মেনন প্রভৃতির সহিত একত্র ছিলাম। বাঙ্গলাদেশের ছয়টি সেণ্ট্রাল জেলে এবং কয়েকটি ডিষ্ট্রিক্ট জেলেও ছিলাম। আমি বহু বৎসর সাধারণ কয়েদীর মত ছিলাম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম এবং বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম। আমি ষ্টেট-প্রিজনার ছিলাম, ডেটিনিউ ছিলাম, সিকিউরিটি বন্দী ছিলাম। জেলখানার পেনাল-কোডে যেমন শাস্তির কথা লেখা আছে এবং যেসব শাস্তির কথা লেখা নাই, তাহার প্রায় সবগুলি সাজাই ভোগ করিয়াছি: ভারতবর্ষের ব্রিটিশ জেলের বেশীর ভাগ সময় অসহ্য উৎপীড়নে জীবনের ত্রিশ বৎসর আমার কাটিয়াছে, জেলে এবং জেলের বাহিরে ৫৮ বৎসর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের—

কারাবাসের কথা

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর পুলিশ দেশবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী অবধি তাঁকে হাজতেই রাখা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইনফ্লুয়েঞ্জায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। দু' তিন দিনে জ্বরের প্রকোপ কমলো বটে কিন্তু একেবারে জ্বর ছাড়লো না, প্রতিদিনই সন্ধ্যায় অল্প-অল্প জ্বর হয়, হাত-পা ও কোমরের বেদনায় রাত্রে ঘুম হয় না। ক'দিনের মধ্যেই তাঁর চেহারা অত্যন্ত মলিন হয়ে উঠলো। দেহের সেই অবস্থাতেই তাঁর উপর ছ' মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল।

সেণ্ট্রাল জেলের ফিমেল ওয়ার্ডে দেশবন্ধুকে স্থান দেওয়া হোল। ওই ওয়ার্ডে তিনটি কুঠরী ছিল। যে ঘরে দেশবন্ধুর থাকার স্থান হোল সেটা চার হাত চওড়া ও ছ' হাত লম্বা। ঘরটী প্রায় অন্ধকার, বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না। গরমে তিনি ছটফট করতেন। তখনও প্রতি সন্ধ্যায় জ্বর আসে। সারা রাত ঘুমোতে পারেন না। তবে সুভাষচন্দ্র, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, হেমন্তকুমার সরকার, চিররঞ্জন দাস প্রভৃতি তখন সেই ওয়ার্ডেই ছিলেন, সুভাষবাবু ও অরবিন্দবাবু সেবার মধ্য দিয়া যতটা স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যায় দেশবন্ধুর জন্য তা করতে সদাই সচেষ্ট থাকতেন।

জেলের খাদ্য ছিল অতি কদর্য, দেশবন্ধু ধীরে ধীরে ওজনে কমতে লাগলেন।

খবরটা বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। চারিদিকে উৎকণ্ঠা ও বিরূপ সমালোচনার ফলে গবর্মেণ্ট শেষে ১৫ই মার্চ দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক কমিউনিক বাহির করলেন এবং হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডি, এন, রায়ের উপর ভার দিলেন দেশবন্ধুকে চিকিৎসা করার। কয়দিনের মধ্যে দেশবন্ধুর বহুমূত্র রোগ দেখা দিল, দাঁতের গোড়ায় দেখা দিল অসহ্য বেদনা, ক'দিনের মধ্যেই পাঁচটি দাঁত তুলে ফেলতে হোল স্থপথ্যের একান্ত অভাব দেখে বন্ধু-বান্ধবদের একান্ত অনুরোধে দেশবন্ধু জেলের খাদ্য খাওয়া ছাড়লেন, বাড়ী থেকে খাবার আনাবার ব্যবস্থা হোল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট দেশবন্ধুকে এক নম্বর ওয়ার্ডের উপরের তলায় থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। "এই ঘরখানি বেশ বড় ও স্বাস্থ্যকর। রৌদ্র ও বাতাস বেশ খেলিত, ঘরটিকেই পরদা টাঙাইয়া শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, বাথরুম, খাওয়ার ঘর, পৃথক পৃথক কামরায় পরিগণিত করা হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি যে চার পাঁচ মাস সেখানে ছিলেন, মাঝে মাঝে জ্বর হইলেও পূর্বাপেক্ষা ভাল ছিলেন।"

তা হলেও দেশবন্ধুর কারাবাস বেশ স্বাচ্ছন্দময় ছিল না। জেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেজর সেলিসবারী প্রতিদিনই আসতেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা কইতেন। জেলের কর্মচারীরাও দেশবন্ধুকে বিশেষ সম্মান করতেন, তবু সময়-অসময় লাঞ্ছনার হাত থেকে তিনি রেহাই পেতেন না। "একদিন প্রেসিডেন্সি জেলে শ্রীমতী বাসন্তী দেবী দেখা করিতে আসিয়াছেন—কথাবার্তার মধ্যে জেলার সাহেব বলিলেন—Please speak aloud, I can't hear (জোরে কথা বলুন, আমি শুনিতে পাইতেছি না)।

তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—I refuse to obey you, (আমি তোমার আদেশ মানিব না)।

তারপর কয়েকদিন দেশবন্ধু আর কাহারও সঙ্গে দেখা করিলেন না।" ব্যাপারটা কর্তাদের কানে উঠলো, গবর্মেণ্ট থেকে জেলারের উপর আদেশ হোল, ওই ধরণের অসভ্যতা যেন আর না দেখানো হয়।

কিন্তু তবু দেশবন্ধুর বিড়ম্বনা কমেনি। "একদিন জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার য়্যাশ তাঁহাকে গেটে নিজের আপিসে ডাকাইয়া লইয়া যান। তখন দুপুরবেলা, ভীষণ রৌদ্র, জ্বর-গায়ে দেশবন্ধু আপিসে উপস্থিত হইলে য়্যাশ সাহেব নিজে চেয়ারে বসিয়া তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া রাখেন। বাড়ীর ডাক্তার আসিয়াছিলেন—তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তার জন্যই ডাকা হইয়াছিল। দেশবন্ধু একটু দাঁড়াইয়াই ফিরিয়া আসেন।

এরপর একদিন দেশবন্ধু স্নান করিতে গিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। তাহাতে পায়ে দারুণ আঘাত লাগে—এই অবস্থায় শ্রীমতী বাসন্তী দেবী অসুস্থ স্বামীর সহিত দেখা করিবার জন্য ভিতরে আসিতে চাহিলে 'বড় সাহেব' তাঁহাকে গেটে বসাইয়া রাখেন এবং বলেন শ্রীযুত দাসকে তিনি চেয়ারে বসাইয়া ভিতর হইতে আনাইতেছেন। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী তাহাতে আপত্তি জানাইয়া ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন—এমন সময় সুপার ভিতরে যাইবার অনুমতি দেন।"

কিন্তু দেখাশুনা করার জন্য যেটুকু সময় নির্দিষ্ট ছিল, সেই সময়টুকু অতিবাহিত হতেই 'বড় সাহেব' জেলারকে পাঠিয়ে দিলেন, জেলার এসে বাসন্তী দেবীকে জানিয়ে দিলেন—আপনার সময় অতীত হয়ে গেছে, আর তো আপনার এখানে থাকা চলে না!

আর একদিন একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার (ইনি পূর্বে নাপিতের কাজ করতেন) দরজা বন্ধ করতে এসে দাস মহাশয়কে অপমান করে। তখনই রীতিমত একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠতো। জেলার তাড়াতাড়ি এসে দেশবন্ধুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন, গোলযোগ মিটে গেল।

এইভাবেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটে।

"এপ্রিল মাসে এমন গরম পড়িল যে আমাদের ওয়ার্ডে বাস করা কঠিন

হইল। গরমের দিনে সন্ধ্যার সময় যেই একটু হাওয়া উঠিত, অমনি প্রহরী আসিয়া
ঘরে বন্ধ করিয়া দিয়া যাইত। এমন অনেক রাত্রি গিয়াছে যে গরমে সারারাত
বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। অসুস্থ শরীরেও দেশবন্ধু এই ক্লেশ আনন্দের
সহিত সহ্য করিতেন। যখন বাহিরে হাওয়ার শব্দ পাওয়া যাইত তিনি হাসিয়া
আমাদিগকে বলিতেন—'ঐ শোনো হাওয়ার শব্দ, এইবার ঘুমিয়ে পড়ো!'
"একদিন রাতে অসুখের জন্য সুপার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া ঘরে কয়েকমিনিট
থাকিতেই গলদ-ঘর্ম হইয়া উঠিলেন্!....এইখানে পাঁচ মাস জেল ভোগ করিবার
পর ডাক্তারের পরামর্শমত দেশবন্ধুকে একটি টেবিল-ফ্যান দেওয়া হয়। সেটির
দাম শ্রীযুত দাস-মহাশয়কেই দিতে হইয়াছিল—কিন্তু দু'দিন না চলিতেই কল
বিগড়াইয়া যাইত।

দেশবন্ধু নিজের ঘর হইতে বড় একটা বাহির হইতেন না। বিকালে ঘরের
বারান্দায় বসিয়া সমবেত দর্শকগণের সঙ্গে কথা বলিতেন। সারাদিন লেখাপড়া
ও চিন্তা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। ভালমন্দ অনেক বাংলা নভেল তিনি অবসর
সময়ে ইচ্ছা করিয়া পড়িতেন এবং বাংলা সাহিত্যের দুর্দশার কথা বলিয়া দুঃখ
প্রকাশ করিতেন। অন্য সময়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রাজনৈতিক, সামাজিক,
দর্শনবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন ও Philosophy of Indian
Nationalism (ভারতীয় জাতীয়তার তত্ত্ব) নামক পুস্তক লিখিবেন বলিয়া
নোট্স্ লিপিবদ্ধ করিতেন।...."

বন্দী জীবনের নানা অভাব ও অসুবিধা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর মুখের হাসি মিলায়
নাই, শারীরিক অসুস্থতা তাঁর মনের তেজকে এতটুকু ম্লান করতে পারেনি।

ক্রমে মুক্তির দিন ঘনিয়ে এলো। বাইরে অসম্ভব জনতা হবে আশঙ্কা করে
কর্তৃপক্ষ আগে থেকে কিছুই জানায় নি। হঠাৎ ৯ই আগষ্ট (১৯২২) রাত
সাড়ে আটটার সময় মেজর সেলিসবারী এসে বললেন—Mr. Das, your son

is ready with car, please get yourself ready; you are released!

দেশবন্ধু ও দেশপ্রাণ শাসমল জেলারের পিছু পিছু বাহির হয়ে গেলেন।

অন্যান্য কয়েদীরা তখন কুঠরীতে বন্ধ ছিল, বিদায় জানাতে পারলো না কেউই, সবাই শুধু ব্যারাকের মধ্যে কোলাহল করতে লাগলো! সকলের শুধু মনে হতে লাগলো—'মেজর সাহেব আজ আমাদের মধ্যে থেকে দেবন্ধুকে ধরে নিয়ে গেলেন!'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়লো জেলখানার বুকে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের—

বন্দী-জীবন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে বহু বৎসর কারাবাসে কাটাতে হয়, ইংরাজ সরকার বিচারে ও বিনা-বিচারে বার বার তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। বৃটিশ-রাজের কাছে তিনি ছিলেন বিপজ্জনক ব্যক্তি। ভাবপ্রবণ কর্মী মানুষটির সমস্ত কর্মশক্তি ও আদর্শবাদকে নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করার কোন চেষ্টাই শাসকেরা বাকী রাখেননি। কিন্তু কারাগারের অবরুদ্ধ নির্জনতা সুভাষচন্দ্রের মনে নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ জাগিয়েছিল। তিনি ভাবতেন ঃ

"জেলে আছি—তাতে দুঃখ নেই। মায়ের জন্য দুঃখ ভোগ করা সে ত' গৌরবের কথা! Sufferingsয়ের মধ্যে আনন্দ আছে, একথা বিশ্বাস করুন। তা না হ'লে লোক পাগল হ'য়ে যেত, তা না হ'লে কষ্টের মধ্যে লোক হৃদয়ের আনন্দে ভরপুর হ'য়ে হাসে কি করে? যে বস্তুটি বাহির থেকে sufferings বলে বোধ হয়—তাকে ভিতর থেকে দেখলে আনন্দ বলেই বোধ হয়।....আমি যখন ধীরভাবে চিন্তা করি, তখন আমার নিঃসংশয় ধারণা জন্মে যে, আমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অন্তরে একটী মহত্তর উদ্দেশ্য কাজ করছে।....সাধারণতঃ একটী দার্শনিক ভাব বন্দীদশায় মানুষের অন্তরে শক্তির সঞ্চার করে। আমিও সেই-খানেই আমার দাঁড়াবার ঠাঁই ক'রে নিয়েছি এবং দর্শন বিষয়ে যতটুকু পড়াশুনা করা গেছে সেটুকু এবং জীবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তাও আমার বেশ কাজে লেগেছে। মানুষ যদি তার নিজের অন্তরে ভেবে দেখবার মত

যথেষ্ট বিষয় খুঁজে পায় বন্দী হলেও তার কষ্ট নেই। ....জীবনকে সহজভাবে বিচার ক'রে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। ভালভাবে বিচার করবার পর এই সিদ্ধান্ত আরো দৃঢ় হয়েছে। কারাগারে আমার যতই দিন যাচ্ছে ততই আমার মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হচ্ছে যে, জীবনসংগ্রামের মূলে রয়েছে মতবাদের সংঘর্ষ—সত্য এবং মিথ্যা ধারণার সংঘর্ষ। কেহ কেহ ইহাকে সত্যের বিভিন্ন স্তর বলে থাকেন। মানুষের ধারণাই মানুষকে চালিত করে থাকে। এই সমস্ত ধারণা নিষ্ক্রিয় নয়, ক্রিয়াশীল ও সংঘর্ষাত্মক।.... এই সমস্ত ধারণা নিজেদের পথ নিজেরাই সৃষ্টি ক'রে নেবে। আমরা তো মাটীর পুতুল মাত্র, ভগবানের তেজরাশির কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র আমাদের মধ্যে নিবদ্ধ। আমাদিগকে এই ধারণার নিকট আত্মোৎসর্গ করতে হবে।"

তবে কারাজীবনের নির্জনতা মাঝে মাঝে মনের উপর বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে তোলে, তার অনিবার্য প্রভাব থেকে বন্দী নিজের চিত্তকে মুক্ত করে নিতে পারেন না। দীর্ঘ কুড়ি মাস যখন তিনি সুদূর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় কারাগারে ছিলেন, তখন সেখানকার প্রভাতের অরুণালোক, সেখানকার অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান রশ্মিরেখা তাঁর মনকে ব্যথাতুর করে তুলতো।

"প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটি বঙ্গজননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্ততঃ বলে পাঠাই, বৈষ্ণবের ভাষায়—

তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা,
বহিতে আমার সুখ।

সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আক্রমণে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উচ্চ প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর

লাভ করে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার সূর্যাস্তের দৃশ্য। এই কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত!

প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দায় আঘাত করে বলে, "অন্ধ জাগো"—তখনও মনে পড়ে আরেক সূর্যোদয়ের কথা, যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঙ্গলার কবি, বাঙ্গলার সাধক বঙ্গজননীর দর্শন পেয়েছিল।...."

নতুন করে বাংলার মাটির জন্য, শ্যামল পরিবেশের জন্য, আত্মীয়-পরিজনদের স্নেহ, জানা-চেনা মুখের দুটো কথা শোনার জন্য মাঝে মাঝে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠতো। "এখানে না এলে বোধ হয় বুঝতুম না সোনার বাঙ্গলাকে কত ভালবাসি। আমার সময়ে সময়ে মনে হয়, বোধ হয় রবিবাবু কারারুদ্ধ অবস্থা কল্পনা করে লিখেছেন—

'সোনার বাংলা! আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'

যখন ক্ষণেকের তরে বাঙ্গলার বিচিত্র-রূপ মানস চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠে—তখন মনে হয় এই অনুভূতির জন্য অন্ততঃ এত কষ্ট করে মান্দালয় আসা সার্থক হয়েছে। কে আগে জানত—বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জল—বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—এত মাধুরী আপনার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।........"

দেশের প্রতি এই আকর্ষণ দীর্ঘবিচ্ছেদের মধ্যে যতই নিবিড়ভাবে অনুভব করেছেন, মানসিক দৃঢ়তা সকল দুঃখ বরণ করে নেবার জন্য ততই অনমনীয় কঠিন হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—"আমি যে শুধু কারারুদ্ধ হইয়াছি তাহা নয়, বিশ মাস হইল আমি দেশান্তরিত। বাঙ্গলার মাটি, বাঙ্গলার জলের পবিত্র স্পর্শ হইতে কতকাল যাবৎ আমি বঞ্চিত! তবে আমার সান্ত্বনা ও

সৌভাগ্য এই যে, আমার কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। আজ 'আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে' ফুটিয়াছে। এইখানে আসিবার পূর্বে আমি বাঙ্গলাকে, ভারতভূমিকে ভালবাসিতাম। কিন্তু এই বিচ্ছেদের দরুণ সোনার বাঙ্গলাকে, পুণ্য ভারতভূমিকে শতগুণে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস—'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' বাঙ্গলার মোহনীয় রূপ আজ আমার নিকট কত পবিত্র, কত সুন্দর হইয়াছে। যে অত্যন্তিক আত্মোৎসর্গের আদর্শ লইয়া আমি কর্মভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নির্বাসনের পরশমণি আমায় দিন দিন সে মহাদানের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। যে চিরন্তন সত্য বাঙ্গলার ভাগীরথী ও বাঙ্গলার ঢেউখেলানো শ্যামল শস্যক্ষেত্রে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার যে প্রাণধর্মকে বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্যন্ত প্রতিভাবান মনীষিগণ সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিয়া সাহিত্যের মধ্যে প্রকট করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার যে বিচিত্র রূপ কত শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলিকার বিষয় হইয়াছে, আজ তাহার আভাস পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এই অনুভূতির পুণ্য প্রভাবে আমার দুই বৎসর কারাবাস সার্থক হইয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, এহেন মায়ের জন্য দুঃখ ও বিপদ বরণ করা কত গৌরবের, কত সৌভাগ্যের কথা!....স্বরাজ লাভের পুণ্য প্রচেষ্টাই যেন আমার জীবনের জপ, তপ ও স্বাধ্যায়, আমার সাধনা ও মুক্তির সোপান হয় এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি যেন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে নিরত থাকিতে পারি।"

কিন্তু এই দার্শনিক ভাবধারা নেতাজীর জীবনী-শক্তিকে সঞ্জীবিত রাখতে পারেনি। দীর্ঘ বন্দীদশা তাঁর দেহমনে অকালবার্ধক্যের বিরসতা ঘনিয়ে তোলে। "আপনার অজ্ঞাতসারে এসে চেপে ধরে,....তুমি ধারণাই করতে পারবে না, কেমন করে মানুষ দীর্ঘকাল কারাবাসের ফলে ধীরে ধীরে দেহে ও মনে অকাল-বৃদ্ধ হয়ে যেতে থাকে, অবশ্য অনেকগুলি কারণই এর জন্যে দায়ী—যথা, খারাপ খাদ্য, ব্যায়াম বা স্ফূর্তির অভাব, সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন থাকা, একটী অধীনতার

শৃঙ্খলতার, বন্ধুজনের অভাব এবং সঙ্গীতের অভাব, যাহা সর্বশেষে উল্লিখিত হলেও একটা মস্ত অভাব। কতকগুলি অভাব আছে যা মানুষের ভিতর থেকে পূর্ণ করে তুলতে পারে, কিন্তু আবার কতকগুলি আছে যেগুলি বাইরের বিষয় দিয়ে পূর্ণ করতে হয়। এইসব বাইরের বিষয় থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অকালবার্ধক্যের জন্য কম দায়ী নয়। আলিপুর জেলে ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য সাপ্তাহিক বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু আমাদের নেই। পিক্‌নিক্, বিশ্রম্ভালাপ, সঙ্গীত চর্চা, সাধারণ বক্তৃতা, খোলা জায়গায় খেলাধূলা করা, মনোমত কাব্য সাহিত্যের চর্চা— এ সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনকে এতখানি সরস ও সমৃদ্ধ করে তোলে যে, আমরা সচরাচর তা বুঝতে পারি না এবং যখন আমাদিগকে জোর করে বন্দী করে রাখা হয় তখনই তাদের মূল্য বুঝতে পারা যায়।”

এই মানসিক বিক্ষোভই ধীরে ধীরে সুভাষচন্দ্রের দেহকে জীর্ণ করে তোলে, এবং তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। দেহের এই অবসাদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তিনি অন্য দিকে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু অসুস্থ দেহে কুলিয়ে উঠবে কেন? তিনি পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। তখনকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—“Systematic study অনেক দিন হইল ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছি। জাতীয়তার ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি মূলসমস্যার সমাধানের জন্য লেখাপড়া ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলাম। আপাততঃ কাজ বন্ধ আছে। কবে আবার আরম্ভ করিতে পারিব জানি না।”

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সংশয় জাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ সুভাষচন্দ্র জানতেন—“৺লোকমান্য তিলক কারাবাসকালে গীতার সমালোচনা লেখেন। এবং আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মনের দিক দিয়ে তিনি সুখে দিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়েও আমার নিশ্চিত ধারণা যে, মান্দালয় জেলে ছ’বছর বন্দী হয়ে থাকাটাই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।” কিন্তু এই পড়াশুনার সুখ থেকেও সুভাষচন্দ্র বঞ্চিত হলেন।

সাময়িক একটু আনন্দ আহরণের আশায় সুভাষচন্দ্র মান্দালয়ের হিন্দু কয়েদীদের একত্র করে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে সম্মতি দেন না। সাহেব কয়েদীদের জন্য খেলাধূলা গানবাজনার ব্যবস্থা থাকতে পারে, তারা বড়দিনের আনন্দ জেলের মধ্যেও আহরণ করতে পারে—কারণ শত দোষ থাকলেও তারা সাহেব। দেশীয় লোকদের সে সুবিধা দেওয়া চলে না।

কন্তু বন্দীরা তখন সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ, তারা অনশন সুরু করলো। এবার কর্তৃপক্ষ মাথা নত করলেন। সুভাষচন্দ্র জয়যুক্ত হলেন। তিনি দেশবাসীকে শোনালেন—"আমাদের অনশন ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গবর্মেণ্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অত:পর বাঙ্গলাদেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না, তবে যে principle গবর্মেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই, তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গবর্মেণ্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে "এহো বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন ব্রতের সবচেয়ে বড় লাভ, অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবী পূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিন্তভাবে বলিতে পারে না, তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

এই আত্মবিশ্বাসেই সুভাষচন্দ্র রুগ্ন দেহেও সংকল্পে অটল ছিলেন। যখন

ভারত সরকার কথা তুললেন, তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে পাঠাবেন নিরাময় করার জন্য, কিন্তু যাবার আগে সুভাষচন্দ্র আত্মীয়স্বজন কারুর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, জাহাজ ভারতের কোন বন্দরে থামবে না, তখন সুভাষচন্দ্র সে সর্তে রাজী হননি। সুভাষচন্দ্র তখন বললেন—"আমার আদর্শ যে একদিন জয়ী হইবে সে সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সুতরাং আমার স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কোন চিন্তাই করি না।....রাত্রির পর যেমন দিন আসে, আমাদের চেষ্টাও ঠিক তেমনি সত্য সত্য সফল হইবেই। আমাদের শরীর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে কিন্তু অটল বিশ্বাস এবং দুর্জয় সংকল্পের বলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের চেষ্টার সফল পরিণতি দেখিবার মত সৌভাগ্য কাহার হইবে একমাত্র ভগবানই তাহার বিধানকর্তা। আমার সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, আমি আমার কাজ করিয়া যাইব, তারপর যাহা হয় হইবে।"

বন্ধুদের সুভাষচন্দ্র লেখেন—"আমার মুক্তির কথা আমি আর ভাবি না— তোমরাও ভাবিও না। ভগবানের কৃপায় আমি এখানে মানসিক শান্তি পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে এখানে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতে পারি— এরূপ শক্তি পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়।"

এই আত্মবিশ্বাসের বলেই যক্ষ্মাক্রান্ত বিপ্লবী রবিবাবুর ভাষায় তরুণদের আহ্বান জানিয়েছিলেন—

"এখনো বিহার কল্পজগতে
জেলখানা (অরণ্য) রাজধানী,
এখনো কেবল নীরব ভাবনা
কর্মবিহীন বিজন সাধনা
দিবানিশি শুধু বসে বসে শোনা
আপন মর্মবাণী।........

* * *

মানুষ হতেছি পাষানের কোলে.......

* * *

গড়িতেছি মন আপনার মনে

যোগ্য হতেছি কাজে !

* * *

কবে প্রাণ খুলি বলিতে পারিব

পেয়েছি আমার শেষ !

তোমরা সকলে এস মোর পিছে

গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,

আমার জীবনে লভিয়া জীবন

জাগরে সকল দেশ !"

তবু বন্দীর মন, মাঝে মাঝে গরাদের পানে তাকিয়ে, পিছনের উঁচু পাঁচীলের পানে তাকিয়ে, উদাস হয়ে ওঠে। "মনে হয় যেন কত যুগ ধরে এখানে রয়েছি। এ যেন আমার ঘর-বাড়ী ; কারাগারের বাহিরের কথা যেন স্বপ্নের মত, প্রহেলিকার মত বোধ হয় ; যেন ইহজগতে একমাত্র সত্য হচ্ছে লৌহের গরাদ ও প্রস্তরের প্রাচীর।"

আবার তখনই সেই দুঃখবোধের মাঝে জেগে ওঠে আত্মতৃপ্তি—"পিঞ্জরের গরাদের গায়ে আঘাত করে যে জ্বালা বোধ হয়—সে জ্বালার মধ্যেও যে কোনও সুখ পাওয়া যায় না—তা আমি বলতে পারি না। যাঁকে ভালবাসি—যাঁকে অন্তরের সহিত ভালবাসার ফলে আজ আমি এখানে—তাঁকে বাস্তবিক ভালবাসি—এই অনুভূতিটা সেই জ্বালার মধ্যেই পাওয়া যায়। তাই বোধ হয়, বদ্ধ দুয়ারের গরাদের গায় আছাড় খেয়ে হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হলেও—তার মধ্যে একটা সুখ, একটা শান্তি—একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়।"

বাহিরের জগৎ থেকে মনকে সরিয়ে এনে সুভাষচন্দ্র জেলের ভিতরে বৈচিত্র্য

খোঁজেন, কারাগারকে ভাল করে জানতে ও বুঝতে চান, অপরাধীদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের সুখদুঃখের কাহিনী শোনেন, তাদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি ভাবেন—"প্রকৃতপক্ষে জেলখানায় এসে অনেক শিখেছি। অনেক সত্য যাহা একসময় ছায়ার মত ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে, অনেক নূতন অনুভূতিও আমার জীবনকে সরল ও গভীর করে তুলেছে। যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেন ও মুখে ভাষা দেন—তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাঙ্ক্ষা ও স্পর্ধা আছে।"....

অপরাধীদের সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেন—"অপরাধী—মনস্তত্ব আলোচনা করে আমার চোখ ফুটে গেছে। আমার মনে হয়, মোটের ওপর তাদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করা হয়। ১৯২২ সালে যখন আমি জেলে ছিলাম, তখন একটা কয়েদী আমাদের yardএ ভৃত্যের কাজ করত। সে সময় আমি মহাপ্রাণ দেশবন্ধুর সহিত এক কারাপ্রাঙ্গণে একই ঘরে বাস করতাম। দেশবন্ধুর প্রাণটা ছিল খুবই কোমল, তাই সহজেই এই কয়েদীর দিকে তিনি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সে একটা পুরাণো পাপী, আটবার তার সাজা হয়, কিন্তু সেও কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই দেশবন্ধুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে এবং আশ্চর্য রকমের শক্তির পরিচয় দেয়। কারামুক্তির সময় দেশবন্ধু তাকে বলেছিলেন যে জেল থেকে মুক্তি পেলে সে যেন বরাবর তাঁর কাছে যায় আর তার পুরাণো সহকারীদের ছায়া যেন না মাড়ায়। কয়েদীটি রাজী হয়েছিল ও কথামত কাজও করেছিল। তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে যে, যে ব্যক্তি এক সময়ে পুরাণো দাগী ছিল, সে এখন উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে তাঁর বাড়ীতে বাস করছে এবং মাঝে মাঝে অভদ্র মেজাজ তার দেখা দিলেও সে যে এখন শুধু অন্য মানুষ তাহা নয়, অধিকন্তু বেশ সরল ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে।"

এই জন্যই সুভাষচন্দ্র কারাগারের সংস্কার করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন যেখানে অপরাধীরা নিষ্ঠুর কঠোরতার মধ্যে উত্তরোত্তর মনুষ্যত্ব বিসর্জন না দিয়ে, স্নেহ ও সহানুভূতির ভেতর দিয়ে নিজেকে সংশোধিত করে নেবার সুবিধা পাবে—কারাগার এমনভাবে সংস্কৃত হওয়া উচিত!

তিনি লিখেছেন—"কোন ভদ্র বা সুশিক্ষিত ব্যক্তি কারাবাস পছন্দ করতেই পারে না। জেলখানার সমস্ত আবহাওয়াটাই মানুষকে যেন বিকৃত ও অমানুষ করে তোলারই উপযোগী, এবং আমার বিশ্বাস এ কথাটা সকল জেলের পক্ষেই খাটে। আমার মনে হয়, অপরাধীদের অধিকাংশেরই কারাবাসকালে নৈতিক উন্নতি হয় না, বরং তারা যেন আরো হীন হয়ে পড়ে। একথা আমাকে বল্‌তেই হবে যে এতদিন জেলে বাস করার পর কারা-শাসনের একটা আমূল সংস্কারের একান্ত প্রয়োজনের দিকে আমার চোখ খুলে গেছে এবং ভবিষ্যতে কারা-সংস্কার আমার একটা কর্তব্য হবে।"

কিন্তু এই কর্তব্য পালন করার মত অবসর সুভাষচন্দ্র পান নি। সবচেয়ে বড় যে প্রয়োজন সেই স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি জীবনকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। আই-সি-এসের চাকরী প্রত্যাখান করা থেকে সুরু করে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের গদীচ্যুত করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তা করতে কোন দিন এতটুকু দ্বিধা করেননি। প্রয়োজনে তিনি গান্ধিজীর বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছিলেন, আবার দেশে যখন কোন আশার আলো দেখতে পাননি, তখন জীবন বিপন্ন করে বিদেশে গিয়ে স্বাধীন ভারত-সরকার গঠন করে ভারত আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। আজ স্বাধীন দেশে তিনি জীবিত থাকলে কারা সংস্কার তাঁর কাছে অতি সামান্য ব্যাপার ছিল মাত্র। কারাগার থেকে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যে দোষ-ত্রুটি তাঁর চোখে পড়েছিল তা সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে নিষ্কলুষ করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—"ভারতীয় কারাশাসনপ্রণালী একটা খারাপ অর্থাৎ বৃটিশ প্রণালীর আদর্শের

অনুসরণমাত্র, ঠিক যেমন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা খারাপ অর্থাৎ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শের অনুকরণ। কারা-সংস্কার বিষয়ে আমাদের বরং আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স-এর মত উন্নত দেশগুলির ব্যবস্থাই অনুসরণ করা উচিত।"

আজ নেতাজী সুভাষচন্দ্র নাই, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে, স্বাধীন ভারতে তাঁর সহকর্মীরা আজ রাষ্ট্রের কর্ণধার। মহান সর্বত্যাগী নেতাজীর এই নির্দেশকে তাঁরা সফল করে তুলুন, স্বাধীন ভারতের জীবন মনুষ্যত্বের পরিপোষক হোক—আমরা সেইদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর—

জেলের জীবন

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর তিন মাস কারাদণ্ড হয়—২৬শে ডিসেম্বর থেকে ১৮ই মার্চ অবধি ভেলোর সেণ্ট্রাল জেলে এই তিনটি মাস তিনি অতিবাহিত করেন। বিনাশ্রম কারাদণ্ড। একটি ঝুলির মধ্যে তিনি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে কারাগারে আসেন—একটি টুথ্ পাউডার, এক দিস্তা কাগজ, কতকগুলি আল্‌পিন, কয়েকটি পেন্সিল, একটি ঝরণা-কলম, একদোয়াত কালি, একটি পিতলের পিয়ালা ও কয়েকখানি বই ঃ বাইবেল, সেক্‌স্‌পীয়র তামিল মহাভারত, ইংরাজী মহাভারত ও রবিন্‌সন্ ক্রুশো, একজোড়া চশমা, একখানি শাল, হাঁপানির একবোতল ওষুধ ও গায়ের ফোঁড়ার জন্য এক কৌটা মলম।

কারাগারে প্রবেশমাত্রেই তাঁর গলায় একখানি কাঠের চাকৃতি ঝুলিয়ে দেওয়া হোল, তাতে লেখা ছিল ঃ

কয়েদী নং ৮৩৯৪

ভর্তির তারিখ—২১, ১২, ১৯২১

মুক্তির তারিখ—২০, ৩, ১৯২২

এবং কয়েদী পরিচয়ে লেখা হোল ঃ

রাজনৈতিক বন্দী, ক্রমিক সংখ্যা ৮৩৯৪

ভর্তির তারিখ—২১, ১২, ১৯২১

আপীল করতে অনিচ্ছা প্রকাশ—২৪, ১২, ১৯২১

নামঃ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচার, ব্রাহ্মণ, সাধারণ সম্পাদক—ইণ্ডিয়ান ন্যাশান্যাল কংগ্রেস।

শিক্ষাঃ 'সি' (অর্থাৎ অশিক্ষিত)

বিচারঃ সাব্-ডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট, ভেলোর, ১৯২১ সালের ৮২ নং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারার ২নং বিধি।

শাস্তিঃ তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

ভর্তির তারিখঃ ১১, ১২, ৯২১

মুক্তির তারিখঃ ২০, ৩, ১৯১২

বয়সঃ ৪২ বৎসর

উচ্চতাঃ ৫ ফীট ৪ ইঞ্চি

ওজনঃ ১০৪ পাউণ্ড

একটি সেলে রাজাজীকে একা থাকতে দেওয়া হোল; ঘরখানি ১১½ ফীট লম্বা, ৮ ফীট চওড়া। একদিকের দেয়ালে ৬ ফীট উঁচুতে একটি ফুকর করা আছে, তাতে আবার গরাদ দেওয়া। ফুকরটি জানালা বলা যায় না, ৪½ ফীট লম্বা, ১ ফীট চওড়া একটী ঘুলঘুলি মাত্র। সামনের দরজাটি প্রকাণ্ড,—৩ ফীট উঁচু, ৬ ফীট ৯ ইঞ্চি চওড়া। দরজার বাহিরেই আছে ৫ ফীট চওড়া একটি বারান্দা, তারপরেই উঠান, উঠানের এক কোণে একটি পায়খানা। সেই পায়খানার পাশ দিয়ে একটি নর্দমা বরাবর এসে ড্রেনটি আছে ঠিক রাজাজীর সেলের জানালার নীচে, প্রস্রাবের দুর্গন্ধে মাঝে মাঝে রাজাজী অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। পায়খানার উল্টো দিকে একটি কল, সে কলে আবার সব সময় জল পাওয়া যায় না। একজন কয়েদী রাজাজীকে বলেন যে কিছুদিন পায়খানায় শৌচের জন্য জল দেওয়া হোত না, কয়েদীরা কাদা দিয়ে শৌচ করতেন।

বাহিরের উঠানে গুটি চারেক গাছ ছিল। সেই সারিতে পর পর আঠারোখানি ঘর ছিল, শেষ দিকের ঘরগুলি নির্দিষ্ট ছিল ফাঁসীর আসামীদের জন্য।

এই সেলের মধ্যে দিনের বেশীর ভাগ সময়েই তাঁকে তালাবদ্ধ করে রাখা হোত।

প্রথম দিন গরাদের পাশে বসে সহসা বাড়ীর কথা মনে উঠলো, ছেলেমেয়েদের চিন্তা মনকে ব্যাকুল করে তুললো। নিজেকে বড় দুর্বল বলে মনে হোল। এই চিত্তদৌর্বল্য জয় করার জন্য নিজেকেই রাজাজী প্রশ্ন করলেন—'প্রবাসে যখন লোকে ব্যবসা করতে যায় তখন কি সে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে থাকে না? আমিও ভাবি না কেন যে আমি বিদেশে ব্যবসা করতে এসেছি। জেলে আছি এ কথা মনে তোলার দরকার কি?' তবু চিত্ত জয় করতে সময় লাগে। সন্ধ্যাসমাগমে গায়ত্রী জপে বসেন। আহ্নিক করতে করতে মনস্থির হয়। মনে হয় ভগবান তাঁকে শুদ্ধ ও শক্তিমান করে তোলার জন্যই কারাগারে পাঠিয়েছেন। 'সত্য ও ন্যায়ের জন্য পৃথিবীতে ক'টা লোক কারাবরণ করে? বিশ্বের সেই ক'জন লোকের মধ্যে আমার স্বদেশবাসীর সংখ্যাই বা কত সামান্য? সেই মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আমি একজন। এ তো নেহাৎ কম গর্বের কথা নয়।' পরমেশ্বর তাঁকে এই গর্বের সুযোগ দিয়েছেন, তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে এই দুঃখ সইতে হবে!

একক কারাবাসের মধ্যে দু'টি বিষয়ে একান্ত অভাব মনে জাগে—সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ও সঙ্গীত। এই দু'টি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকলে বোধ হয় জনহীন মরুভূকেও আনন্দময় করে তোলা যায়।

রাজাজী নিজের কার্যসূচী ঠিক করে ফেললেন।

প্রত্যুষে সাড়ে পাঁচটায় উঠে আহ্নিক।

তারপর বিছানা তুলে, দাঁত মেজে, মুক্ত প্রাঙ্গণে খানিকক্ষণ ভ্রমণ।

প্রাতঃরাশ।

পিকদানি ধোয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এক কুঁজো খাবার জল তোলা।

৭-২০ মিনিট থেকে ৮-৪০ মিনিট পর্যন্ত চরকা কাটা।

তারপর একঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পুস্তক পাঠ।

মুখ হাত ধুয়ে মধ্যাহ্নিক আহার।

১১-৩০ মিনিট থেকে ১১-৪৫ মিনিট পর্যন্ত চরকা কাটা।

পনেরো মিনিট বিশ্রাম।

২-৩০ মিনিট পর্যন্ত রবিন্‌সন্ ক্রুশো পাঠ।

তারপর ৩-১৫ পর্যন্ত সূতা কাটা।

তারপর স্নান, কাপড় কাচা, দাড়ি কামানো ও ৫-১০ মিনিটে আহার।

আহারশেষে বাসনমাজা, জল তোলা ও বিছানা পাতা।

৬-৫০ মিনিট থেকে ৭টা পর্যন্ত সন্ধ্যাহ্নিক।

তারপর ৮-১৫ মিনিট পর্যন্ত বাইবেল ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ।

বিশ্রাম।

কিন্তু জীবনটা এতো সহজে কাটে না। ছারপোকা ও মশা-মাছির উপদ্রবে মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। তার উপর হাঁপানির কষ্ট তো আছেই। নতুন উপসর্গ জুটেছিল ফোঁড়া ও জ্বর। এবং তার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যও ছিল। গায়ের একটা ফোঁড়া তো একবার অপারেশন করতে হোল। ক'দিন হাঁসপাতালে থাকতে হয়েছিল এর মধ্যে। তবে রাজাজীর উপর কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ছিল ভালো। সেজন্য আহারাদির সম্পর্কে তিনি কিছু কিছু সুবিধা পেয়েছিলেন। মাঝে কর্তৃপক্ষ তাঁর জন্য আধ পাউণ্ড রুটি, এক আউন্স মাখন, আধ সের দুধ ও কয়েকটি টাট্‌কা বিলাতীবেগুনের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে কর্তারা তাঁর জন্য বিশেষ আহারের ব্যবস্থা করেন: সকালে ভাতের ফেন, তারপর আধ পোয়া আটার দু'খানি চাপাটি, তিন ছটাক পাঁউরুটি, এক সের দুধ, এক আউন্স মাখন, দেড় আউন্স চিনি ও তিন আউন্স সাগু। তবে রাজাজী গোড়ার দিকে

সাগু খেতেন না, দিয়ে দিতেন মালীকে, পরে এইটাই তাঁর দুপুরের আহার্য হয়। মাঝে একবার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট এসে সব খোঁজখবর নিয়ে পাঁউরুটি বন্ধ করে দিলেন, দুধ এক পো কমিয়ে দিলেন। তারপর থেকে দুধ যা আসতে লাগলো, সে সবই মাখনতোলা জলের মত।

রাত্রে প্রস্রাবের গন্ধে অনেক সময় মাথা ধরে যায়, বারবার জেলের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে তবে একটু ফিনাইল দেবার ব্যবস্থা হয়। এই নিরানন্দ পরিবেশের মাঝে বৈচিত্র্য আনে কয়েকজন কয়েদী।

একবার একজন নাপিত এলো কামাতে, মিথ্যা অভিযোগে বেচারার দশ বছর জেল হয়েছে। কথায় কথায় সে বললো—আমার বাড়ী আছে, গরু-বাছুর আছে। এক আয়ামার (ব্রাহ্মণ দারোগা) এসে আমার দুধওলা গাইটা চেয়ে বসলো, আমি বললাম—'দোব না।' সে আমাকে এক মিথ্যা ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে দিল, আমার পাঁচ বছর জেল হয়ে গেল। তারপর আবার আরেক দফা মিথ্যা অভিযোগে হোল আরো পাঁচ বছর। ন'বছর চার মাস কেটে গেছে আর আট মাস বাকী। আমায় বলে চোর ডাকাত, আমি চুরি করতে যাব কোন্ দুঃখে, আমার জায়গাজমি ঘরবাড়ী সবই তো আছে, আমার অভাব কিসের? আবার আদেশ জারি করা আছে যে ছাড়া পাবার পরেও তিন বছর আমাকে রোজ থানায় হাজির দিতে হবে!

নিধন সিং ছিলেন রান্না করার কাজে। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করার অপরাধে তাঁকে আন্দামান যেতে হয়েছিল। 'রাম রাম' বা 'নমস্তে' তিনি বলতেন না, যখনই যে খাবার আনতেন তখনই তিনি বলতেন—বন্দে মাতরম্! কথা বলতেন ইংরাজীতে কিন্তু যা বলতেন তার কিছুই রাজাজী বুঝতে পারতেন না, শুধু তিনটি শব্দ তিনি শুনতে পেতেন—can, may, pay! শুনতে শুনতে তিনি বুঝলেন নিধন সিংয়ের pay মানে 'দেওয়া'। He pays dal, মানে 'সে

ডাল দেবে', he pays chappati মানে 'সে চাপাটি দেবে', you pay letter মানে 'তুমি চিঠি দাও।'

সুব্বারাও ছিলেন সত্যাগ্রহী কয়েদী। জেলার অকারণ একদিন গালি দেওয়ার জন্য তিনি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে অভিযোগ জানান, তিনজন কয়েদী তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়, ফলে তিনজনের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দেবার ব্যবস্থা হয়। সুব্বারাও তখন কর্তৃপক্ষকে অনশন করার অভিপ্রায় জানান। জেলের কোন অন্যায় সুব্বারাও সইতে পারতেন না। একবার দু'জন সত্যাগ্রহীকে ওয়ার্ডার ধাক্কা মেয়ে ফেলে দেয় এবং একজন কয়েদীকে আঘাত করে, সুব্বারাও তখনই তার প্রতিবাদ করেন। জেলার তো সে কথা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো, বললো—একে জেলের এক কোণে নিয়ে গিয়ে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দাওগে! তারপর নিজেই ছুটে এসে সুব্বারাওয়ের গালে কয়েকটা চড় বসিয়ে দিলে। রাজাজী সামনেই ছিলেন। ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াতে পারে ভেবে, খানিক পরে জেলার রাজাজীর কাছে এসে বললো—মাথার ঠিক থাকে না মশাই, যত চোর ডাকাতকে শায়েস্তা রাখা! আপনি ব্যাপারটা বাহিরে উপরওয়ালাদের কাছে জানাবেন না!

রাজাজী বললেন—আপনার মাপ চাওয়া উচিত।

সুব্বারাওকে রাজাজী ডেকে পাঠালেন। সুব্বারাও এসে বললেন—আপনি আমাকে মেরেছেন তার জন্য আমি দুঃখিত নই, একজন অপরাধীর উপর অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করে আমি মার খেয়েছি, এ আমার গৌরব। আপনি আরো মারলেও আমি দুঃখিত হতাম না। ভগবান আপনার কল্যাণ করুণ।

যে লোককে একটু আগে সে প্রহার করেছে, তিনি তারই কল্যাণ কামনা করছেন! সহসা জেলারের মুখে কোন কথা জোগালো না। ধীরে ধীরে সে বললো—আমি যা করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত।

সুব্বারাওয়েরই জয় হোল।

হীরা সিং ছিলেন হংকংয়ের ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে তিনি চার লাখ টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্যাংকক্ পালিয়ে যান, সেখান থেকে সিংহপুর, সেখান থেকে একেবারে পাঞ্জাবের এক গাঁয়ে। বৃটিশ গবর্মেণ্ট তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অপরাধে। চারলাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করে তাঁর যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হয়। ছ' বছর হাজারিবাগের জেলে তাঁকে সেল থেকে বেরুতে দেওয়া হয়নি, ছ' বছর তিনি সূর্যালোক দেখেননি, তারপর তিনি একদিন জেল থেকে পালান, কিন্তু আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তারপর জেলখানায় কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, ভালো করে বসতে পারেন না, কিন্তু সেজন্য তিনি উৎসাহ হারাননি। কথায় কথায় বলেন—আমি এ সব গ্রাহ্য করি না, ডোণ্ট কেয়ার, জেলই তো আমার বাড়ীঘর।

আহারের কদর্যতা ও জেল-কর্তাদের অনাচার যখন চরমে ওঠে, তখন এক কয়েদী-ছুতোর রাজাজীকে একদিন প্রশ্ন করেন—কবে এই অনাচারের শেষ হবে বলতে পারেন? কবে স্বরাজ আসবে? ব্যাটারা আমাদের দিয়ে তিন টাকার কাজ করিয়ে নেয়, কিন্তু খেতে দেয় আধ-পেটা, গোটা গোটা ডাল—সিদ্ধ করে না, একটু নুণ চাইলে পাওয়া যায়না!

সবশেষের ঘরে থাকে অপ্পাভূ ও নাগিয়া নামে দুই ফাঁসীর আসামী। অনেক রাত অবধি শোনা যায় তাদের কথাবার্তা। হয়তো অনেকেরই ঘুমের ব্যাঘাত হয় কিন্তু ফাঁসীর আসামী বলে কেউ কোন বিরক্তি প্রকাশ করে না। মাঝে মাঝে নাইট-ডিউটি দিতে এসে সিপাহী সাবধান করে দেয়—আপ্পাভু! নাগিয়া!

ক'দিন পরে নাগিয়ার আর গলা শোনা যায় না। সিপাহী বলে—সে স্বর্গে গেছে, সেখানে পেট ভরে খাচ্ছে।

পেট ভরে খাওয়াটা জেলের বাসিন্দাদের কাছে সবচেয়ে বড় কথা।

তারপর একদিন শোনা যায় আপ্পাভুরও ফাঁসী হয়ে গেছে। আপ্পাভু দশ ছেলের পিতা। ছেলেরা তার বাবার মৃত্যুসংবাদ পেলে কি না কে জানে!

এই ফাঁসীর আসামীদের অবস্থাটা বড়ই বেদনাদায়ক। হয়তো ফাঁসীর আদেশ মাপ করার জন্য তারা আপীল করেছে, আপীল মঞ্জুর হোল কি না তা তারা জানতেও পারলো না, একদা প্রভাতকালে সহসা সিপাহী এসে সামনে দাঁড়ালো, বললো—চল, আজ তোমার ফাঁসী! কেউ তাকে দুটো ভালো কথা বললো না, বাড়ীতে সে একটু খবরও দিতে পারলো না, বাড়ীর লোকেরা তার মৃত্যুসংবাদও জানলো না, পরে হয়তো তার মৃতদেহটা পাঠিয়ে দেওয়া হোল কোন মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য! তবে যদি কারুর বেলা গবর্মেণ্টের কোন নির্দেশ থাকে তবেই তার জন্য একটু সুব্যবস্থা হয়। জেল কর্তৃপক্ষের এ এক চরম নিষ্ঠুরতা!

অবশ্য জেলখানায় আরো অনেক ছোটখাট নিষ্ঠুরতা আছে। সশ্রম কারাদণ্ডীদের দৈনিক স্নান করার জল দেওয়া হয় না। রাজাজীর সময় ভেলোর জেলের সশ্রম কারাদণ্ডীরা প্রতিদিন স্নান করার অধিকার চাইল, রাজাজীও তাদের হয়ে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের কাছে সুপারিশ করলেন। কয়েদীরা বললো—তাদের স্নান করার জল তারা নিজেরাই তুলে নেবে! সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বললেন—বেশ, আমি সে ব্যবস্থা করবো।

কিন্তু করলেন না কিছুই।

শেষে অনেক বলা-কওয়ায় সপ্তাহে তিন দিন স্নানের ব্যবস্থা হোল। জেলার বললো—রোজ স্নান করলে অতো জলের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না!

তবে রাজনৈতিক বন্দীদের কারাবাসের ফলে জেলের কর্তারা তাঁদের বর্বরতা কিছুটা সংযত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কারণ তাঁদের ভয় ছিল এই কাহিনী যদি বাহিরে প্রকাশ পায় তাহলে স্বদেশীর লোকেরা আন্দোলন চালাতে পারে।

জেলের ভিতরেও ঘুষ ও চুরি চলে, একটু তামাক বা একটা বিড়ির জন্য কেউ খাবার বেশী পায়, কেউ বা ঘুষ নেয়।

এই সব অনাচার দেখতে দেখতে রাজাজীর মনে নানা চিন্তা জাগে। জেলের বাগানে নানারকম শাকসব্জী ফলায়, তা হয়তো চুরি করে বাজারে বিক্রী হয়, নয়তো যায় বড়বাবুদের বাড়ী। কয়েদী বেচারাদের অদৃষ্টে থাকে খোসা, ডাঁটা ও তেঁতুলের টক্। আর ডাল যা দেওয়া হয় তাতে এতো ভুষি থাকে যে কয়েদীরা বলে—ও ডাল ঘোড়াতে খায়! কয়েদীদের কেন পুষ্টিকর খাবার খেতে দেওয়া হবে না, রাজাজী তার কোন কারণ খুঁজে পান না। তিনি ভেবে পান না, জেলের লিখিত আইনে যখন এতো কঠোরতা নেই, তখন কারাগারের কর্তারা অহেতুক তাকে এতো কঠোর করে তুলবে কেন?

রাজাজী কত কথা চিন্তা করেন, আবার বসে বইও পড়েন। কখনো পড়েন 'ট্রায়াল্ এণ্ড্ ডেথ্ অফ্ সক্রেটিস্', কখনো পড়েন রামায়ণ, কখন-বা পড়েন মার্গোলিয়াসের লেখা হজরৎ মহম্মদের জীবনী। পড়তে পড়তে কখন কখন মনে সন্দেহ জাগে, এই পড়াশুনা করে কি লাভ, নিজের মনকে খুসী করা তো স্বার্থপরতার পরিচয়, জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে এর মূল্য কতটুকু? এর চেয়ে এক গজ সূতা কাটার মূল্য যে অনেক বেশী। বই বন্ধ করে রাজাজী চরকা ধরেন। চরকা কাটতে কাটতে কত কথাই ভেসে আসে মনে। জেলারের বাড়ীতে কার যেন বিয়ে, নহবতের সুর ভেসে আসে। রাত্রে শয্যায় শুয়ে শুয়ে সানাইয়ের সুর বেশ মিষ্টি লাগে। দুনিয়ায় কত আনন্দ, কত স্নেহ ভালবাসা! মানুষ যদি ভগবানের নির্দিষ্ট পথ বেয়ে চলতে পারতো, তাহলে জগতের পরিবেশ কত মধুর, কত নির্মল হয়ে উঠতে পারতো! রুদ্ধ দ্বারের পানে তাকিয়ে মনে হয় মায়ের কথা, মা কোনদিন কল্পনাও করেননি যে তাঁর

ছেলে কারাপ্রাকারের অন্তরালে পাষাণ-শয্যায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করবে। আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে কত দুশ্চিন্তাই জাগতো তাঁর মনে! যীশুকে ভগবান পাঠিয়েছিলেন মানবতার সেবা করতে, রোমের সরকারী বিচারক পাইলেট তাঁকে দিয়েছিলেন ছ' বছর কারাদণ্ড, শাসকরা তাঁকে বিঁধেছিলেন ক্রুশে! বিচিত্র সভ্যতার গতি, অভিনব মানুষের নীতি।

শেষে একদিন মুক্তির আদেশ আসে, সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট ফটক অবধি এগিয়ে এসে করমর্দন করে বলেন—আর কারাগারে আসবেন না!

রাজাজী কোন জবাব দেন না, পাষাণপুরীর স্মৃতি তখন তাঁর মনকে বেদনা-চঞ্চল করে রেখেছে।

বীণা দাসের—

'শৃঙ্খল-ঝঙ্কার'

—এক—

১৯৩৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সিনেট-হলে বাংলার দুর্দান্ত লাট-সাহেব স্যার ষ্টানলি জ্যাকসনের উপর গুলি চালালো একটি বি-এ পাস করা মেয়ে। গুলি লাগলো না, মেয়েটি ধরা পড়লো। তার নাম বীণা দাস।

দু' দিন পরে বাবা ও মা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আই-বি অফিসে। গোয়েন্দারা পিতাকে বললো—ওকে শুধু রিভলভারের সিকরেট্‌টা বলে দিতে বলুন, তা হলেই ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

মেয়েটির তেজ কিন্তু তখনও এতটুকু কমেনি, বললো—আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না, আমার বাবা মেয়েকে বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।

গোয়েন্দারা আর কিছু বলতে সাহস পেল না।

মায়ের চোখে জল, যাবার সময় পুলিশের কাছে ব্যাকুলভাবে বলে গেলেন—ওকে একটু দেখবেন, একটু দয়া করবেন, ও আমার বড় আদরের মেয়ে!

সে চোখের জল মেয়েটির মনে দাগ রেখে গেল, কাগজ কলম নিয়ে সে বসলো চিঠি লিখতে, কলমের মুখে বাহির হোল ছন্দ ঃ

"পরিপূর্ণ স্বর্গসুখে হানি তীব্র বাজ
অরক্ষিত ক্ষুদ্র নীড়টুকু
দোলাইয়া প্রচণ্ড আঘাতে
সারি সর্ব কাজ
হেথা আজি দাঁড়ায়েছি আসি।

এখানেও কেন আসে ভাসি
চারিদিক হতে শত প্রিয় কণ্ঠস্বর ?
পিতার উদ্যত বাহু জননীর কাতর অন্তর
ঠেলি সর্ব বাধা কেন চাহে হরিবারে
বিশ্রদ্ধ বক্ষের মাঝে গৃহছাড়া অশান্ত কন্যারে ?
মোরে ডাকিও না হেথা একা রব পড়ি
দুটি ক্ষীণ হস্তে মোর আঁকড়িয়া ধরি
সর্বোত্তম গর্ব মোর সর্বাধিক লাজ
মোর সারা জীবনের কাজ।
জানি তাহা লাগে নাই ভালো তোমাদের
আপনি স্বদেশমাতা ফিরান আনন
তবু হের তারও পরে সাধনায় ব্যর্থ জনমের
প্রসন্ন স্নেহের হাসি হাসিছেন মোর নারায়ণ।"

প্রথমেই নিয়ে আসা হোল মেদিনীপুর জেলখানায়।

কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিফেন্‌স্ হত্যা মামলার আসামী শান্তি ও সুনীতি ছিলেন সেখানে, প্রথম পরিচয়েই বীণাকে তাঁরা অভ্যর্থনা জানালেন হাসিমুখে, শুনিয়ে দিলেন একখানি গান :

'চলে বন্ধুবিহীন একা
মোছে রক্তে ললাট কলঙ্ক-লেখা ;
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান,
জাগে নিঃশঙ্ক শঙ্কর ত্যাজিয়া শ্মশান।'

কয়েকটা দিন ভালই কাটলো।

কিন্তু শান্তি ও সুনীতিকে সেখানে রাখা হোল না, বীণাকেও দেওয়া হোল সেলাইয়ের কাজ।

কাঁচি আর সূচ সুতো চালাতে চালাতে দিনগুলি নীরস হয়ে ওঠে, মনটা হয়ে ওঠে অন্য জগতের। "আশা নেই, উৎসাহ নেই, আনন্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই। ভোরবেলা উঠেই মনে প্রথম কথা জাগে: 'কেন ভোর হোল? কি করব এই শিশিরসিক্ত সোণালী সকাল দিয়ে? কোন প্রয়োজনই যদি আমাদের নেই, কেন ভোরের পাখী এসে আমাদের ঘুম ভাঙায়, কেন ভোরের হাওয়া কানে কানে শুনিয়ে যায় সুদূরের নিমন্ত্রণ?' উঠতে ভালো লাগে না, তবু উঠতে হয়। উঠে স্তূপীকৃত ঝাড়ন নিয়ে সেলাইয়ের কলের সামনে অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনে নিয়ে ফেলি। তারপর সারাটা দিন ধরে চলে ওই ঝাড়ন কাটা, জোড়া, সেলাই করা। তাতেও হয় না, দু' চারখানা কম হলে অফিস থেকে বাবুরা বলে পাঠায়—'কাজ কম হচ্ছে কেন? ওদের বলবে খোরাকি পোষাচ্ছে না যে!' তারপর আসে বিকেল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে থালায় ভাত নিয়ে বসি খেতে। তারপর বাসন ধুয়ে বাইরের উঠানে কয়েক মিনিট বেড়াতে না বেড়াতেই শুনি জমাদারণীর সরস আহ্বান—'চলো গো, লক্-আপ হতে চলো।' এই তো আমাদের দিন, এই আমাদের সন্ধ্যা, এই আমাদের রাত্রি।"

এই নিষ্করুণ দিনগুলিকে একটু মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য, একদিন উঠান থেকে এক রাশ বেল আর রজনীগন্ধা এনে ঘরে রাখেন। সন্ধ্যাবেলা দরজা বন্ধ করতে এসে জেলার বলেন—'জমাদারণী, ঘরে এতো ফুল কেন, ফেলে দাও শিগ্‌গীর! তারপর বীণার পানে তাকিয়ে বলেন—'আপনার এটা বোঝা উচিত, এটা জেল, বিলাসিতার জায়গা নয়!'

আরেক দিন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট ঘরে এসে দেখেন এক খানি হাতপাখা, প্রশ্ন তুললেন—'একি! হাতপাখা যে এখানে?'

হাতপাখাখানি সুপার নিয়ে গেলেন।

জেল-আইনে কয়েদীর ঘরে ফুল কি হাতপাখা রাখা চলে না!

ফিমেল ওয়ার্ডে জেলারের জুলুম ক্রমেই বাড়তে লাগলো, বীণা প্রতিবাদ

তুললেন। প্রথমে জানালেন জেল-সুপারকে, কিন্তু সুপার কোন উত্তর দিলেন না! ম্যাজিস্ট্রেট এলেন একদিন জেল দেখতে, তাঁকে বললেন—চোখের সামনে এসব আমরা সহ্য করতে পারছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—না দেখতে পার চোখ বন্ধ করে থাক!

অন্য উপায় না দেখে সমস্ত মেয়ে-কয়েদীরা একদিন অনশন করলেন। এবার কর্তাদের টনক নড়লো। জেলারকে সেখান থেকে বদলী করা হোল। কয়েদীদের জয় হোল।

মেদিনীপুর থেকে হিজলী।

এখানে নিয়মের কড়াকড়ি কম, সঙ্গিনীও অনেক। অবসর ছিল যথেষ্ট, বইও ছিল প্রচুর,—ডেটিনিউদের কেনা বই, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বই, বাড়ী থেকে পাঠানো বই।

"শুধু পড়াশুনাই নয়, নানা রকম খেলাধূলা, গান, অভিনয়, প্রতিযোগিতা, তর্ক, আলোচনা—সব মিলিয়ে হিজলীটাকে আমরা ছোটখাট একটি 'শান্তিনিকেতন' করে তুলেছিলাম। প্রায়ই উৎসব লেগে রয়েছে—কখনো বর্ষামঙ্গল, কখনো রবীন্দ্রজয়ন্তী, কখনো-বা বিজয়া-সম্মিলনী।

কিন্তু সেও কতদিন ?....ক্রমে ক্রমে মনের উৎসাহ ম্লান হয়ে আসে।....ঘরের দরজা খুলে দিয়ে গেলেও ঘরেই শুয়ে বসে দিন কাটাই—দেওয়ালের গায় মনের কথাটি লিখে রাখি—

শুধু বড় ক্লান্ত লাগে,
আলো বড় রূঢ় লাগে চোখে।"

সহসা একদিন বীণাকে নিয়ে আসা হোল সেণ্ট্রাল জেলে।

বিকালে চা খাচ্ছেন এমন সময় জমাদারণী এসে বললো—ও বীণা দিদি, শিগ্‌গীর নেবে এসো, গান্ধী এয়েছে।

উজ্জ্বলা ও বীণা ত্রস্তে নীচে নেবে এলেন। নীচের হাসপাতালের ঘরটি ধোওয়া-মোছা পরিষ্কার, সমস্ত আসবাবমুক্ত—কেবল একটিমাত্র আস্তরণ বিছানো। আর তারই উপর বসে গান্ধিজী ও একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ। দু'জনে গিয়ে প্রণাম করতেই গান্ধিজী হাসিমুখে দু'জনকে কাছে ডেকে নিলেন, পরিচয় করিয়ে দিলেন মহাদেব দেশাইয়ের সঙ্গে। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—কি তোমরা ভাবছ? বাইরে গিয়ে কি করবে? নিজেদের পথ ভুল বলে মনে কর কি না?

বীণা বললেন—বাইরে গিয়ে কি করবো এখনই কি করে বলি? দেশের অবস্থা বুঝে নিজেদের পথ ঠিক করে নিতে হবে তো। আর হিংসা-অহিংসা আমাদের কাছে চিরদিনই তো যুক্তি উপযোগিতার প্রশ্ন; আপনার মত ধর্ম হিসাবে তো নিতে পারিনি। সেও নির্ভর করবে দেশের প্রয়োজনেরই উপর।

স্নিগ্ধকণ্ঠে গান্ধিজী বললেন—এমন খোলাখুলিভাবে কথা বলায় বড় সুখী হলাম কিন্তু তর্কের সময় তো এটা নয়। তোমরা বাইরে চলো, বাইরে গিয়ে আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে—তখন আলোচনা করবো।

মহাদেব বললেন—সেই-ই ভালো, বাইরে গিয়ে তোমরা গান্ধিজীর মত বদল করবে এবং গান্ধিজী তোমাদের।

বীণা ও উজ্জ্বলা হেসে উঠলেন, বললেন—কিন্তু গান্ধিজীর মত বদল করবার আশা তো আমরা একেবারেই রাখি না। মহাত্মাজী, আপনিও কি আশা রাখেন আমাদের মত বদলাতে পারবেন?

গান্ধিজী হাসলেন, বললেন—জান না বুঝি? আমি কখনও নিরাশ হই না। অল্প কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা চলে গেলেন।

এর ঠিক এক বছর পরে বীণা, উজ্জ্বলা প্রভৃতি সকলেই মুক্তি পেলেন।

—দুই—

১৯৪২ সালের আগষ্ট-আন্দোলনের সময় হাজরা পার্কে এক সভা ডাকার ফলে আবার গ্রেপ্তার হতে হোল।

"জেলের ভিতর এসে আবার গতবারের মত সেই বিতৃষ্ণা আর অরুচি মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।....

প্রথম কিছুদিন বাইরের কোন খবরই পেতাম না। খবরের কাগজ যদিই বা দিত তার সর্বাঙ্গ কালি-লেপা। শত লেবু ঘসে, শত আলোর সামনে ধরেও তার এক বর্ণেরও পাঠোদ্ধার করা যেত না। কিন্তু খবর পাওয়ার ভালো উপায়ই পাওয়া গেল। সাত আট দিন ব্যবধানে জেলে এক এক করে এসে ঢুকতে লাগলো আগষ্ট-বিদ্রোহিণীর দল। ওদের কাছে বেশ একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেল।

কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল-ওয়ার্ড অন্য সব জেলের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। মোটে জায়গা নেই, ছোট্ট একটুখানি উঠোন, ঘরগুলোর তিন দিক বন্ধ, এক দিক খোলা। সেই খোলা দিকের সামনে আবার ব্যাফ্‌ল্‌-ওয়াল্‌ তোলা। তবু শুধু কলকাতায় থাকতে পাবার আনন্দের জন্য আমরা সমস্ত কষ্টই সহ্য করতে রাজী ছিলাম।....পনেরো দিন পর পর বাড়ীর ইণ্টারভিউ পেতাম, এক ঘণ্টার জন্য বাড়ীর লোকেদের খুব কাছাকাছি পাওয়া যেত; সেটা একটা মস্ত সুখ ছিল বৈকি!

আমাদের দোতলার দু' একটী সেল থেকে কলকাতা শহরের রাস্তাঘাট গাড়ী-মোটর দেখা যেত। সময়ে অসময়ে সেখানে গিয়ে বসাটা আমাদের একটা বিলাসিতা ছিল। একদিন অবশ্যি এর জন্য কম বিব্রত হতে হয়নি! ব্যাপারটা এই: আমাদের এক সঙ্গিনী ছাড়া পেয়ে বাইরের ওই জায়গায় এসেছিল আমাদের দেখতে। পুটুদি জানালা থেকে তাকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওর জেল-ফাটানো গলায় চিৎকার আরম্ভ করে দিল—'ওমা,

করুণ এসেছে—কোথায় তোমরা! শিগ্‌গীর এসো, করুণ আমাদের দেখতে এসেছে।' চিৎকার শুনে আমরাও হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম।" ফলে জমাদারণীর সঙ্গে খানিকটা বচসা হয়ে গেল।

পরদিন সুপার ডেকে পাঠিয়ে বললেন—তোমরা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলে?

—না।

—কিন্তু জমাদারণী যে বলছে?

—মিথ্যে বলছে।

—তোমরা কাল বিকালে জানলার ধারে যাওনি?

—নিজের ঘরে জানলার ধারে যাব তাতে আপত্তির কি আছে?

—বাইরের লোকের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলনি?

—না। নিজেরা চেঁচামেচি করেছি।

—তোমাদের প্রথম অপরাধ, আমি সাবধান করে দিচ্ছি।

পরের দিনই প্রত্যেকটি জানালায় পুরু করে তারের জাল দিয়ে দেওয়া হোল।

প্রেসিডেন্সি জেলের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পাগলী। পাগলা গারদে যখন জায়গা থাকে না, তখন যতদিন না জায়গা পাওয়া যায় ততদিন তাকে জেলের মধ্যে রাখা হয়। "একটি পাগলী ছিল রীতিমত সুন্দরী, অল্প বয়স, কি কষ্টে পাগল হয়েছে কে জানে। তার কাজ ছিল সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে সারারাত চিৎকার করে কাঁদা। এমনিতেই তো জেলের ভিতরকার আবহাওয়া বেশীর ভাগ সময়েই থম্‌থম্ করে। তার উপর এমনি করে সারারাত ধরে পাগলীর কান্না শোনা! আমরা সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম আমাদের প্রত্যেকটী রাজবন্দিনীর পাগল [হয়ে উঠবার আর বেশী দেরী নেই। আর

একটি ফিরিঙ্গী পাগলী ছিল, তার অভ্যাস ছিল, দেখা হলেই জড়িয়ে ধরবে, সুবিধে পেলেই আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের বিছানায় শুয়ে পড়বে, আর একবার শুলে আর ওঠানো যেত না, গায়ে দুর্দান্ত জোর। সমস্তক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হোত তাকে নিয়ে।"

"পণ্ডিত জহরলাল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন জেলের মধ্যে শিশুর অভাববোধটা ছিল অন্যতম। আমাদের ফিমেল-ওয়ার্ডে এই অভাববোধটা অবশ্যি ছিল না।....প্রায়ই নিত্য নতুন শিশুসমাগম হোত।....

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এমন সময় টুং টুং করে বাইরের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো।....আসামী এল নাকি? ছুটে গেলাম সবাই। সশব্দে দরজা খুলে ঢুকে এলো কালো ফুটফুটে একটী বছর চারেকের ছেলে। ঢুকেই ছেলেটি সশব্দে কান্না জুড়ে দিল, বেরিয়ে যেতে চায়। জমাদারণী ওর মুখের উপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।....আমাদেরই মধ্যে একজন ছুটে গিয়ে ছেলেটীকে কোলে তুলে নিলেন—'ও খোকা, পাখী দেখবি? লাল পাখী?'

....ছেলেটি কোল থেকে নেমে পড়তে চায়, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—'বাবার কাছে যাব, খুলে দাও দরজা।'

ও দরজা যে খোলে না, শত অনুনয়েও যে খুলবে না,—অতটুকু শিশু কি করে আর বোঝে!....জমাদারণী খোকাকেও অন্য ঘরে আসামীদের সঙ্গে জোর করে বন্ধ করে দিল। রাতেও অনেকবার ছেলেটির কান্না শোনা গেল। সকালবেলা উঠে দেখলাম ছেলেটি দিব্যি জমাদারণীর সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে।.... শুনলাম ওর মা নাকি হাসপাতালে রয়েছে, অসুস্থ বাবা বিচারাধীন আসামী, অন্য ওয়ার্ডে আছে। কাজেই মেয়েদের ওয়ার্ডে নারায়ণকে (ছেলেটির নাম) পাঠিয়ে দিয়েছে।

....দুষ্টু ছেলে নারাণ...ভারী নোংরা।....প্রথম প্রথম নারাণ ছুঁলে কাপড়

ছাড়তাম, হাত সাবান দিয়ে ধুতাম। কিন্তু ক্রমে সে সবই গেল।·· ভোরে জোর লক্ আপ্ খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে মশারি তুলে উঁকি মারতো—'এই বাবু ওঠ্, ওঠ্ না।' বাবু ডাকটা ও কোথা থেকে যে শিখেছিলওই জানে।····

মাঝে মাঝে ওর বাবার সঙ্গে কোর্টে যেত নারাণ। একদিন বেশ একটু দেরী করে ফিরলো সে। জমাদারণী এসে খবর দিল—'শুনেছেন দিদিমণি, নারাণের মা মরে গেছে হাসপাতালে আর ওর বাপের মাত্র এক মাস সাজা হয়েছে।'

নারাণকে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলো—কি রে নারাণ, কি হল তোর ?

গম্ভীর মুখে ছেলে বলে—এক মাস সাজা।

····একমাস তো সত্যিই বেশী দিন নয়। একদিন ওর বাবার দিন এসে গেল। দুপুরবেলা ঘুমন্ত ছেলেকে জমাদারণী ডেকে তুললে—'নারাণ, ওঠ বাড়ি যাবি চল।'····

আমাদের মধ্যেও সোরগোল পড়ে গেল,—'নারাণের জন্য খাবার নিয়ে এস, নতুন-সেলাই-করা জামাটা পরিয়ে দাও, চুলটা ঠিক করে দাও, মুখে একটু পাউডার।' তাছাড়া সবার হাতে একটি করে বাক্স্, নারাণের বিদায়-বেলার উপহার। বোকা ছেলে কি ভাবছিল কি জানি····তার মুখের সেই দুষ্টু হাসি আজ একবারও দেখা গেল না, সেই অনর্গল কথাও সব বন্ধ। খালি কালো ঢলঢলে চোখ দুটি লাল। গেট থেকে বেরুনোর পর কিন্তু বাবার কোলে উঠে দুষ্টু ছেলে হাসছে—গালের জল অবশ্যি তখনও শুকায়নি।"

নারাণের পর এল বাবলু, ছ' মাসের শিশু। চুরি করার জন্য ওর মায়ের এক বছর জেল হয়েছিল।

"এবারও প্রেসিডেন্সি জেলে আমরা প্রায়ই নানারকম জলসা, অভিনয় আর উৎসবের আয়োজন করতাম। এবার আগের বারের চেয়ে কড়াকড়ি

কম! জেলের অফিসাররা কেউ কেউ নিজেরা এসে আমাদের স্টেজ বেঁধে দিয়ে যেতেন। বাইরে থেকে সাজ-পোষাক, পরচুলা সবই আনানো হোত। কাজেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠার কোনো বাধাই আর থাকত না।"

এই ভাবেই তিনটি বছর কেটে গেল!

শেষে ১৯৪৫ সালের শরৎকালের একটি শুভ্র প্রভাতে বীণা আবার বাইরের আলোয় এসে দাঁড়ালেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর—

বন্দীজীবনের কথা

—এক—

১৯২১ সালের লখনৌ-জেলখানা। পুরাণো তাঁতশালার পাশে বিশ ফীট লম্বা ষোল ফীট চওড়া একখানি চালাঘর। সেই ঘরখানিতে স্থান পেয়েছেন জহরলাল, পিতা মতিলাল, আর দু'জন আত্মীয়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য তিন মাস জহরলালকে জেলে থাকতে হয়েছিল।

দীর্ঘ সময়। কংগ্রেস সম্পাদকের অতি ব্যস্ত জীবনের মাঝে পৌণে দু' বছর একান্ত কর্মহীন পরিচ্ছেদ। সময় যেন আর কাটতে চায় না। সকালে একখানি খবরের কাগজ আসে, সেটী পড়ে ও আলোচনা করে খানিকটা সময় কাটে, কিন্তু তারপর ?

কাজ চাই। জহরলাল সকালে উঠেই ঘরখানি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে সুরু করলেন। তারপর কাপড় কাচা, তারপর চরকায় সূতা কাটা। তবু তো সময় কাটে না। জেলারকে বলে অনুমতি নিলেন, যে সব স্বেচ্ছাসেবক জেলে এসেছে তাদের কিছু কিছু লেখাপড়া শেখাবেন। পুরটা নিরক্ষরদের কিছু কিছু হিন্দী ও উর্দু শেখাতে আর মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান দিতেই কাটলো। সন্ধ্যাবেলায় সুরু করলেন ভলিবল খেলা।

জীবনযাত্রা খানিকটা নিয়মিত করার ব্যবস্থা করেছেন, এমন সময় সহসা খবর এলো তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

—দুই—

কিন্তু সে মুক্তি বেশী দিন রইল না, ছ'সাত সপ্তাহ পরে আবার ফিরে আসতে হোল জেলখানায়।

এবার আর আগের সুবিধা রইল না। এবার লম্বা ব্যারাক, পঞ্চাশজন বন্দী, দু'হাত অন্তর এক একটি বিছানা। সব সময়েই কথা, সব সময়েই তর্ক আর আলোচনা, এতটুকু নির্জনতা নেই, উনপঞ্চাশ জোড়া চোখ সব সময়েই যেন মুখের পানে তাকিয়ে আছে। সকালে উঠে স্নান করে, কাপড় কেচে, ব্যারাকের মাঝেই খানিকক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করার পর আর কোন কাজ নেই। শুধু কথা আর কথা, সারাদিন কথা বলতে কার ভালো লাগে? মাঝে মাঝে ব্যারাকের বাইরে উঁচু পাঁচীলটার পাশে গিয়ে বসতেন। টুকুরো আকাশের খানিকটা দেখা যায়, মেঘের পর মেঘ ভেসে যায়। বর্ষার মেঘাবৃত আকাশের গায় সূর্যের কিরণে আলো ছায়ার খেলা চলে। কিছুক্ষণ আর মনে থাকে না বন্দীত্বের কথা, মন হারিয়ে যায় অনন্ত আকাশের গায়! ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামে, খেয়াল থাকে না। টুকরো আকাশটা যেন কিছুতেই পুরাণো হতে চায় না। জেলের চারিপাশের ধূসর পাঁচীলের মাঝে ওইটুকুই যেন সীমাহীন মুক্তির সন্ধান দেয়।

ক্রমশঃ জেলে কড়াকড়ি বাড়লো, জহরলাল ও তাঁর ছ'জন সঙ্গীকে আলাদা ব্যারাকে সরিয়ে দেওয়া হোল, পঞ্চাশজনের হট্টগোল থেকে পণ্ডিতজী রক্ষা পেলেন। এখানে পণ্ডিতজী সকালে খানিক দৌড়াদৌড়ি করার পর চামড়ার থলি করে জল তুলতেন, সেই জল সেচ করে ব্যারাকের উঠানে ছোট একটী সব্জী বাগান করতে মন দিলেন, তারপর কিছুক্ষণ সূতা কাটা, তারপর সন্ধ্যা অবধি পড়াশুনা! জেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট যখন আসতেন তখনই দেখতেন জহরলাল পড়ছেন। একদিন সুপার জিজ্ঞাসা করলেন—এতো কি পড়েন?

—যখন যা পাই।

—আমার কিন্তু পড়াশুনা ভালো লাগে না। ও সব ল্যাঠা বারো বছর বয়সেই চুকিয়ে দিয়েছি।

জহরলাল হাসেন, মনে মনে বলেন—সেই জন্য বোধ হয় তোমাকে কারাগারের স্থপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট করা হয়েছে। কোন ভাবনা-চিন্তা বিচার-বিবেচনার দরকার নেই, কয়েদীদের শুধু হায়রানি করতে পারলেই হোল!

কারাগারের মানুষগুলি নিরবচ্ছিন্ন অশান্তির মধ্যে থাকতে থাকতে কর্কশ হয়ে ওঠে, ব্যারাকের ওপাশ থেকে বার বার ভেসে আসে অশ্লীল ইতর ভাষায় গালিগালাজ। শুনতে শুনতে সহসা জহরলালের মনে হয় শিশুর কলহাস্য, নারীর কমনীয় কণ্ঠ এই নিষ্করুণ অসহনীয় পরিবেশ থেকে বহুদূরে, সে আরেক জগতের কথা!

সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝে নানা কথা মনে ভীড় করে আসে, জেলের সব কিছু নিরানন্দ কালো আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়। রাজনীতি ও সমাজনীতি ছাড়িয়ে পণ্ডিতজীর মনে এক নতুন কথা দেখা দেয়—অনেকদিন তিনি কুকুরের ডাক শোনেন নি!

সেবার দীর্ঘ দেড় বৎসর কারাগারে কাটিয়ে জহরলাল মুক্তি পেলেন।

—তিন—

সাত বছর পরে আবার সেই জেলখানা। নৈনী সেন্‌ট্রাল জেলের বিবর্ণ কুৎসিত চারখানা ঘর পনেরো ফীট উঁচু পাঁচীল দিয়ে ঘেরা, তারই একখানি হোল পণ্ডিতজীর শোবার ঘর আরেকখানি স্নানাগার। জেলখানার লোকেরা এই ঘরগুলিকে বলতো 'কুত্তাঘর'।

প্রচণ্ড গরম। পণ্ডিতজী ঘরের ভিতর শুতে পারেন না, খাটখানি বাহিরের বারান্দায় নিয়ে আসেন, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডার এসে খাটখানি শক্ত করে শিকল

দিয়ে গরাদের সঙ্গে বেঁধে দেয়, যেন খাটখানি পাঁচীলের ধারে খাড়া করে পণ্ডিতজী পাঁচীল টপ্‌কে পালিয়ে যেতে না পারেন।

পণ্ডিতজী প্রত্যূষে সাড়ে-তিনটে চারটের সময় ঘুম থেকে উঠতেন। খানিক-ক্ষণ পাঁচীলের ধার দিয়ে দৌড়াতেন। পদক্ষেপ হিসাব করে দেখতেন প্রায় দু'মাইল দৌড়ানো হোত। তারপর ঘণ্টা তিনেক চরকায় সূতা কাটা, দু-তিন ঘণ্টা চওড়া ফিতে বোনা, তারপর পড়াশুনা। নিজের জামা কাপড় পণ্ডিতজী নিজেই কাচতেন।

মাঝে মাঝে মন উতলা হয়ে উঠতো বাহিরের খবরের জন্য, জাগতো আত্মীয়দের জন্য উৎকণ্ঠা। কিন্তু খবরের কাগজ তাঁকে দেওয়া হোত না, একখানি হিন্দী সপ্তাহিক পত্রিকা আসতো, তাই থেকেই তিনি আহরণ করতেন টুকরো টুকরো খবর—পুলিশের লাঠি চালানো, গুলিবর্ষণ, সামরিক-আইন জারী, পতাকা সত্যাগ্রহ। মনটা বাহিরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠতো, আত্মীয়-বন্ধুদের চেনা মুখগুলি একবার দেখতে ইচ্ছা হোত।

সন্ধ্যার পর যে আলো পেতেন তাতে পড়াশুনা চলতো না। খাটের উপর শুয়ে শুয়ে তিনি আকাশের পানে তাকিয়ে থাকতেন। ওয়ার্ডারের কণ্ঠ ভেসে আসতো দূরাগত বাতাশের মর্মরধ্বনির মত। চারিপাশের উঁচু বৃত্তাকার পাঁচীলের পানে তাকিয়ে মনে হোত যেন একটি কূয়ার নীচে বসে আছেন। কখনো-বা মনে হোত এ যেন একটা জনবিরল গভীর জঙ্গল, দূরাগত ওয়ার্ডারের কণ্ঠস্বর যেন কোন কৃষকের শস্যক্ষেত্র বন্য পশু তাড়াবার শব্দ। আকাশের নীল গভীরতার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

এইভাবেই একটি মাস কাটলো।

তারপর এলেন নর্মদা প্রসাদ সিংহ।

আড়াই মাস পরে এলেন পণ্ডিত মতিলাল ও ডাক্তার সৈয়দ মামুদ। নির্জন কারাকক্ষ আত্মীয় পরিজনদের সমাগমে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠলো।

পণ্ডিত মতিলাল ছিলেন অসুস্থ, মাঝে মাঝে তাঁর জ্বর হয়। এদিকে তখন বর্ষাকাল সুরু হয়েছে। ঝম্ ঝম্ করে যখন তখন বৃষ্টি নামে, আর তারই সঙ্গে সুরু হয় ছাদ বেয়ে জল পড়তে। অজস্র ফুটা দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ে ঘর ভেসে যায়। পিতার খাটখানি বারান্দায় সরিয়ে নেওয়া হয়। জেল-সুপার সব জানেন, কিন্তু ছাদ সারাবার কথা তিনি তোলেন না, বলেন—মতিলালজী ইচ্ছা করলে জেলের আর একদিকে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে, সে দিকটা অনেক খোলা অনেক ভালো!

কিন্তু পণ্ডিতজী আত্মীয়-পরিচিতদের ছেড়ে আলাদা থাকতে রাজী হন না।

সুপার শেষে বলেন—বেশ, এখানেই তাহলে আরেকটু বড় বারান্দা তৈরী করিয়ে দিই!

বারান্দা তৈরী হতে সুরু হোল। ধীরে-সুস্থে সরকারী কাজ এগিয়ে চললো। কাজ যখন শেষ হোল তার অনেক আগেই, যাঁর জন্য বারান্দা তৈরী করা তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে যে তিনজন তখন ছিলেন তাঁদের খানিকটা সুবিধা হোল।

সহসা একদিন জেল-জীবনে এক অভিনব অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। গান্ধিজীর চিঠি নিয়ে এলেন স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দরাম রাও জয়াকর—গবর্মেণ্ট কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করতে চান। এঁরা দু'জন হলেন তার মধ্যস্থ। অনেকদিন পরে রাজনীতির আলোচনায় পরিবেশ হয়ে উঠলো উদ্দীপনাময়।

গান্ধিজীর সঙ্গে আলোচনা না করে কিছুই করা চলে না। গান্ধিজী ছিলেন য়েরোড়া জেলখানায়। এক স্পেশাল গাড়ীর ব্যবস্থা হোল, পণ্ডিত মতিলাল, জহরলাল ও ডাক্তার সৈয়দ মামুদ এলেন নৈনী থেকে পুণায়।

তিনদিন ধরে চললো আলোচনা, যুক্তি ও তর্ক। একদিকে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল, জয়রামদাস দৌলতরাম, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত জহরলাল,

সরোজিনী নাইডু ও ডাক্তার সৈয়দ মামুদ আরেক দিকে সাপরু ও জয়াকর। জলখানাটাই কয়েকদিনের জন্য হয়ে উঠলো ওয়ার্কিং-কমিটির বৈঠকী আসর।

তারপর য়েরোড়া থেকে ফিরতে হোল নৈনীতে, পথে কোন বড় ষ্টেশনে ট্রেন থামলো না, কিন্তু মানুষগুলো আগে থেকেই কি করে যেন জানতে পরেছিল, প্রতিটি প্লাটফর্মে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছিল, রেল লাইনের উপরেও অনেক জায়গায় দর্শনেচ্ছুরা অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে।

আবার সেই পুরাতন ব্যারাক।

মতিলাল মুক্তি পাবার পর জহরলালের কাছে পিতার অভাব একান্ত বড় হয়ে দেখা দিল। সারাদিন পিতার সেবা করে যে আনন্দটুকু তিনি পেতেন, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে সব শূন্যময় বলে মনে হোল। প্রতিদিন মতিলালের জন্য যে খবরের কাগজখানি আসতো তা'ও আর আসে না। সময় যেন আর কাটতে চায় না।

সহসা একদিন কারাকক্ষের শূন্য স্থান পূর্ণ করলেন ভগ্নিপতি রণজিৎ পণ্ডিত, বাহিরের খবর এসে পৌঁছলো, অন্তরঙ্গদের খবর পাওয়া গেল, কয়েকটা দিন বেশ জমে উঠলো।

ইতিমধ্যে জহরলালের ছ'মাস কারাদণ্ড শেষ হোল, তিনি মুক্তি পেলেন।

—চার—

আটদিন পরে আবার সেই পুরানো ব্যারাক, সেই তিনজন সঙ্গী—রণজিৎ পণ্ডিত, সৈয়দ মামুদ ও নর্মদাপ্রসাদ।

এবার জেলখানার মধ্যে বিচার হোল—দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং সাত শো টাকা জরিমানা, জরিমানার টাকা না দিলে আরো পাঁচমাস।

পণ্ডিতজী কর-বন্ধ আন্দোলন স্নুরু করে দিয়ে এসেছিলেন, সেই আন্দোলনের অগ্রগতির টুকরো টুকরো কাহিনী শুনতে লাগলেন জেলে বসেই। তারই মধ্যে সহসা নতুন খবর এলো—'জেলে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়েছে।' বেত-মারা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়, পণ্ডিতজী সহ-দণ্ডীদের সহযোগে এক চিঠি লিখলেন গবর্মেণ্টের কাছে—এই ধরণের নৃশংসতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে!

দিনের পর দিন কেটে গেল,—দুটি সপ্তাহ কেটে গেল কিন্তু গবর্মেণ্ট কোন উত্তর দিল না।

পণ্ডিতজী সঙ্গী তিনজনকে নিয়ে তিন দিন অনশন করলেন।

তিনদিনেই পণ্ডিতজীর সাত পাউণ্ড ওজন কমে গেল।

বাইরেও এই ব্যাপার নিয়ে আন্দোলন স্নুরু হোল।

শেষে গবর্মেণ্টকে নতি স্বীকার করতে হোল, কারা-বিভাগের উপর তারা আদেশ জারী করলো—কাউকে যেন আর বেত মারা না হয়!

কিন্তু সে আদেশ স্থায়ী হয়েছিল শুধু কয়েকটি মাস মাত্র।

দীর্ঘ দিন কারাবাস। রণজিৎ পণ্ডিত সামনের প্রাঙ্গণে এক ফুলের বাগান রচনায় মন দিলেন। দেখতে দেখতে রঙীন ফুলে প্রাঙ্গনটী স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো। নিষ্করুণ জেল জীবনের মাঝে এলো স্নুষমা।

আরেকটা বৈচিত্র্য ছিল মাথার উপর গতিশীল প্লেনের গর্জন। কোন কোন দিন শীতের প্রত্যূষে লাল নীল আলো জ্বেলে প্লেনগুলি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেত, কাণে ভেসে আসতো মৃদু গুঞ্জন। যতক্ষণ দেখা যায় প্লেনখানির পানে তাকিয়ে থাকেন। জানা চেনা নেই, তবু মনে হয় যেন নতুন কিছু ঘটলো।

নৈনী জেলের এবারকার আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা—পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের আগমন। অন্য ব্যারাকে তিনি থাকতেন, কিন্তু প্রতিদিন একবার

তাঁর সঙ্গে দেখা করা চলতো। রণজিতের কাছে মালব্যজী জার্মান ভাষা পড়তে স্থুরু করলেন। কিন্তু সে মাত্র কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার, জেলের জীবন তাঁর সহ্য হোল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিলেন।

২৬শে জানুয়ারী পণ্ডিতজী নানা কথা ভাবছেন, অতীত দিনগুলির স্মৃতি আর আগামী দিনগুলির কাজ। জীবনের এই বন্ধুর পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে তাঁরা পৌঁছবেন কে জানে। সত্যই স্বাধীনতার সূর্যোদয় আর কত দূরে, কে বলবে!

দুপুরের দিকে আকস্মাৎ জেলার এসে বললো—পণ্ডিত মতিলালের অবস্থা সঙ্গীন, এখনই পণ্ডিতজীকে বাড়ী যেতে হবে, রণজিৎও তাঁর সঙ্গী হবেন।

ভগ্নিপতির হাত ধরে জহরলাল এলাহাবাদের পথে রওনা হলেন।

—পাঁচ—

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হোল। গান্ধিজী ফিরে আসছেন। জহরলাল বোম্বাই যাচ্ছিলেন, সহসা বম্বে-মেল ইরাদৎগঞ্জ নামে একটী ছোট ষ্টেশনে থেমে গেল, ট্রেনের কামরার মধ্যেই পুলিশ পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করলো। সেখান থেকে মোটরে করে নিয়ে আসা হোল নৈনী জেলে। সঙ্গে ছিলেন শেরওয়ানী, তিনিও বাদ গেলেন না।

জেলের ভেতরেই পণ্ডিতজীর বিচার হোল—দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশো টাকা জরিমানা, জরিমানার টাকা না দিলে আরো ছ'মাস কারাবাস।

সেই পুরানো ব্যারাক, পুরানো সঙ্গী—নর্মদাপ্রসাদ ও রণজিৎ পণ্ডিত। তবে এবার আরো দু'জন নতুন সঙ্গী মিললো, জ্ঞাতিভাই মোহনলাল নেহেরু ও এক সিংহলী যুবক বার্ণার্ড আলুবিহার।

সেই পুরানো রুটিন, সূতা কাটা, পড়াশুনা, আলোচনা ও একখানি সাপ্তাহিক কাগজ সাত দিন ধরে পড়া ; কিন্তু তবুও যেন দিন কাটতে চায় না, মন পড়ে থাকে কারাপ্রাচীরের বাহিরে। পণ্ডিতজী অধীর হয়ে ওঠেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। সাপ্তাহিক কাগজে কোন খবরই থাকে না। মনটা বাহিরের খবর জানবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে ওঠে ম্যাথু-আর্ণল্ডের লেখা কবিতার কয়েকটী পংক্তি ঃ

ওই সমতল ক্ষেত্রে আবার কাল
যুদ্ধ সুরু হবে ;
জান্‌থাস্ আবার রক্তরঞ্জিত হবে ;
হেক্‌টর ও আজাক্‌স্ আবার
আবির্ভূত হবেন ;
হেলেন প্রাচীরের উপর
থেকে সে দৃশ্য দেখবেন।
তখন আমরা হয়তো
ছায়ায় বিশ্রাম করবো,
নয়তো সংগ্রামে দীপ্যমান হয়ে উঠবো ;
আশা নিরাশার মধ্যে
আমাদের মন দুলতে থাকবে,
আমাদের জীবনদানে কি সম্পদ আসবে
আমরা জানবো না।

শত সাবধানতার কড়াকড়ি থাকলেও জেলের মধ্যে বাহিরের খবর কিছু কিছু যথাসময়েই এসে পৌঁছায়, সহসা একদিন রাত্রে খবর এলো—এলাহাবাদে জাতীয় সপ্তাহের যে মিছিল বাহির হয়েছিল তার উপর পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। পুরোভাগে ছিলেন পণ্ডিতজীর মা স্বরূপরাণী, পুলিশ লাঠি মেরে তাঁর মাথা

ফাটিয়ে দিয়েছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পথেই পড়ে গেছেন, তারপর....হয়তো তিনি এখন হাসপাতালে, নয়তো তিনি এতক্ষণে মারা গেছেন।

পণ্ডিতজীর মাথার মধ্যে খুন চড়ে যায়! মনে হয় অহিংসা-নীতি ভ্রান্ত,—রক্তের বদলে রক্ত চাই! জেলখানার সুদৃঢ় উঁচু পাঁচীলটার পানে তাকিয়ে তিনি চুপ করে থাকেন।

মাস খানেক পড়ে মা যখন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে জেলখানায় দেখা করতে এলেন, তখন মনটা তবু একটু শান্ত হোল।

নৈনী থেকে পণ্ডিতজীকে নিয়ে আসা হোল বেরিলী জেলে। চিন্তার ভারে স্বাস্থ্য তখন ভেঙে গেছে, প্রতিদিন জ্বর আসতে সুরু হোল।

সেখান থেকে দেরাদুন।

সেখানে সাড়ে চৌদ্দ মাস কাটিয়ে আবার একদিন তিনি পাঁচীলের বাহিরে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু সে শুধু পাঁচ মাসের জন্য।

—ছয়—

এবারকার কারাবাসের সঙ্গী ছিলেন পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ।

এই সময়কার কারাবাস সম্পর্কে পণ্ডিতজী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন:

"সকল সুব্যবহার ও সুবিবেচনা সত্ত্বেও জেল জেলই। তার নিরানন্দ আবহাওয়া এমনভাবে বুকে চেপে বসে যে সময় সময় অসহ্য বোধ হয়।.... আমি জেলের নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং শারীরিক পরিশ্রম ও অনেকাংশে কিছু কঠিন মানসিক শ্রম করে শরীর ও মেজাজ ঠিক রাখতাম।.... আমি প্রত্যেক কাজের সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম এবং সেই নিয়মে চলতে

চেষ্টা করতাম। যথাসম্ভব সাধারণ অভ্যাসগুলি রক্ষা করে চলতে চেষ্টা করতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ দৈনিক ক্ষৌরকার্যের কথা উল্লেখ করতে পারি (আমাকে সেফ্‌টী-রেজার দেওয়া হয়েছিল)। এই সামান্য ব্যাপারটার উল্লেখ করার কারণ. অনেকে ইহা একেবারে পরিত্যাগ করেন, এবং অন্যান্য ব্যাপারেও শিথিল হয়ে ওঠেন। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়তাম এবং অতি আরামে নিদ্রা যেতাম।

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রম হোত। কখন বা মাস শেষ হতে চাইত না, মনে হোত সময়ের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। সময় সময় আমার চিত্ত বিরক্তি-বিকৃত হয়ে উঠতো, সকলের উপর, সব কিছুর উপর রাগ হোত,—জেলে আমার সঙ্গীগণ, জেলের কর্মচারী-গণ, কোন কিছু কাজ করার বা না করার দরুণ বাহিরের লোকদের উপর, বৃটিশ সাম্রাজ্যের, সর্বোপরি নিজের উপর বিরক্ত হয়ে উঠতাম।....

বাহিরের আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাতের দিবস জেলে এক স্মরণীয় দিন।.... যদি কখনও দেখা সাক্ষাতের সার্থকতা লাভ করতে না পারতাম—কোন দুঃসংবাদ বা অন্য কোন কারণে—তাহলে পরে বড় আর্ত হয়ে পড়তাম। দেখা সাক্ষাতের সময় অবশ্যই জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকতেন। বেরিলীতে দু'তিনবার একজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক কাগজ পেনসিল নিয়ে উপস্থিত থাকতো এবং আমাদের কথাবার্তা ব্যগ্রভাবে লিখে নিত। আমার কাছে ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হোত। এই সব সাক্ষাৎকারের কোন সার্থকতাই থাকতো না।....

এলাহাবাদ জেলে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে আমার মাতা ও পত্নী জেলে ও গবর্মেণ্টের নিকট যে ব্যবহার পেলেন তাতে এই দুর্লভ দেখা-সাক্ষাৎ আমাকে বন্ধ করতে হোল। প্রায় সাত মাস আমি কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিনি। এই দিনগুলি কি নিরানন্দেই না কেটেছে। যখন আমি আবার সাক্ষাৎ করার জন্য

সম্মত হলাম এবং আমার আত্মীয়গণ আমাকে দেখতে এলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হলাম। আমার বোনের ছেলেমেয়েরা এসেছিল। তার ছোট মেয়েটী পূর্বের অভ্যাস মত যখন আমার কাঁধে উঠতে চাইল তখন ভাবাবেগ দমন করা আমার পক্ষে কঠিন হোল। দীর্ঘকাল সঙ্গলাভের জন্য লালায়িত থেকে পারিবারিক জীবনের এই মধুর স্পর্শে আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম।

দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হবার পর, পনেরো দিন পরে বাইরে থেকে এবং অন্য জেল থেকে (আমার দুই বোন তখন জেলে ছিল) যে পত্রগুলি আসতো, তার জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করতাম। নির্দিষ্ট দিনে চিঠি না পেলে আমি চিন্তিত হয়ে পড়তাম, আবার চিঠি পেলেও খুলতে ইতস্ততঃ করতাম। মানুষ যেমন আনন্দদায়ক বস্তু নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, আমিও চিঠি নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। মনে আশঙ্কাও হোত—হয়তো বা চিঠির মধ্যে এমন সংবাদ বা ইঙ্গিত আছে যাতে আমি বিরক্ত হব। জেলের শান্তিপূর্ণ ও নিস্তরঙ্গ জীবনে চিঠি লেখা ও পাওয়া দুইই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ হয়ে ওঠে। এতে এমন একটী ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, যার ফলে দু-একদিন মন উন্মনা হয়ে থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে মন বসানো কঠিন হয়।

....আট মাস কাল আমি দেরাদুন জেলে প্রায় নির্জনে কাটিয়েছি। কয়েক মিনিটের জন্য কোন কারা-কর্মচারী ব্যতীত কথা বলার সুযোগ কদাচিৎ মিলতো। আইনতঃ ইহা নির্জন কারাবাস নয়, অথচ প্রায় তাই, এবং আমার পক্ষে এই সময়টী অত্যন্ত নিরানন্দে কেটেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখাসাক্ষাৎ আরম্ভ করেছিলাম বলে একটু স্বস্তি পেতাম। আমি মনে করি বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ আমাকে বাইরে থেকে প্রত্যহ সদ্যফোটা ফুল পাবার সুযোগ দেওয়া হোত, এতে আমি আনন্দলাভ করতাম। সাধারণতঃ ফুল কি ফটোগ্রাফ রাখতে দেওয়া হত না।....সেলের জিনিষপত্র সুসজ্জিত করে রাখতে দেওয়া হয় না।

....সময় সময় জীবনের আরামগুলির জন্য দৈহিক আকাঙ্খা জাগ্রত হয়—

শরীরের আরাম আয়েস, মনোরম নিরালা, বন্ধু সমাগম, প্রাণবন্ত আলাপ-আলোচনা, শিশুদের সহিত ক্রীড়া....সংবাদপত্রের কোন ছবি বা মন্তব্য, প্রাচীন দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, যৌবনের চিন্তাহীন দিনগুলি মনে পড়ে, গৃহে ফিরবার জন্য মন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, সমস্ত দিন অশান্তিতে অতিবাহিত হয়।"

বেশীর ভাগ সময় পণ্ডিতজী পড়াশুনা করেই কাটাতেন। পড়তে পড়তে সময় সময় ক্লান্তি আসতো, তখন লিখতে বসতেন। এই সময় তিনি মেয়ের কাছে যে ঐতিহাসিক পত্রগুলি লেখেন, তা' পরে 'কন্যার নিকট পিতার পত্র' ও 'পৃথিবীর ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ভ্রমণ কাহিনী পড়তে পণ্ডিতজী বেজায় ভালবাসতেন, সময় সময় ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাতেন। যে সব জায়গা তিনি দেখেছেন, তার স্মৃতি মনে ভেসে উঠতো। কারাকক্ষের উত্তাপ যখন ১১৫ ডিগ্রীতে উঠে অসহ্য বলে মনে হোত, তখন তুষারাচ্ছন্ন মণ্টব্লাঙ্ক, আল্পস্ ও হিমালয়ের ফটো চোখের সামনে মেলে ধরতেন, মনটা সেই বরফাচ্ছাদিত পার্বত্যভূমির শীতলতায় সমাহিত হয়ে যেত!

"রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্মরে, ছায়ার খেলায়
কী মুরতী তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি'।
হে সুদূর আমি উদাসী।
সুদূর, বিপুল, সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাশরি'।" [—রবীন্দ্রনাথ]

চৌদ্দটী মাস একা একা সেলের মধ্যে বাস করা সহজ নয়। দেয়ালের খাঁজ ও দাগ, ঘুণে-ধরা উইয়ে-খাওয়া কড়ি বরগা সব মুখস্থ হয়ে যায়। দেয়ালের

কোন্ কোণে বোল্‌তা আর ভীমরুলের চাক বেঁধেছে, কোন্ বরগাটার ফাটলের আড়ালে ক'টী টিকটিকি থাকে—সব তিনি জানতেন। সেলের বাহিরের প্রাঙ্গণ থেকে হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী দেখা যেত। পণ্ডিতজী মুগ্ধ হয়ে যেতেন। মনে পড়তো কবি লি-তাই-পো'র কয়েকটী পংক্তি ঃ

"ঊর্ধে আকাশে পাখীরা দল বেঁধে উড়ে গেল।
একখণ্ড নিঃসঙ্গ মেঘও ভাসতে ভাসতে চলে গেল।
আমি অদূরবর্তী চিংটিং পর্বতশৃঙ্গের পানে চেয়ে বসে আছি
আমি ও পর্বত, পরস্পরের পানে চেয়ে আমাদের ক্লান্তি আসে না।"

বর্ষার দিনে অবিরাম বৃষ্টি ও ঝড়ের গর্জন অসহ্য হয়ে উঠতো। কখন বা মার্বেলের মত বড় বড় শিলা টিনের ছাদের উপর পড়ে ভয়ানক শব্দ তুলতো।

গ্রীষ্মের দিনে মশা, মাছি ও ছারপোকার অবিরাম সংগ্রাম চলতো।

একদিন কোন একসময় ঘরের একটী বোলতা দৈবাৎ তাঁকে কামড়ে দিল। পণ্ডিতজী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ঘরের মধ্যে যতগুলি চাক আছে সবক'টি ভেঙে দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বোল্‌তাগুলো রুখে দাঁড়ালো। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে লাগলো চাকের চারিপাশে। সহসা পণ্ডিতজীর মনে করুণা জাগলো, হয়তো ওই চাকের মধ্যে তাদের ডিম আছে। চাক আর ভাঙা হোল না। কিন্তু আর কোনদিন কোন বোল্‌তা বা ভীমরুল তাঁকে কামড়ায় নি।

চামচিকে দেখলেই পণ্ডিতজী ভয় পেতেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘরের মধ্যে যখন চামচিকে উড়তো, তাঁর গা ছম্‌ছম্ করতো। মনে হোত এখনই বুঝি চামচিকেটি তাঁর মুখের উপর এসে পড়বে। তিনি শিউরে উঠতেন।

চারিপাশে কত কাঠবিড়ালী ঘুরতো। অনেক সময় যখন তিনি পড়াশুনা করতেন, এক একটী কাঠবিড়ালী তাঁর জানুর উপর উঠে আসতো। তারপর যেই তার চোখ পড়তো পণ্ডিতজীর চোখের পানে, সে ভয়ে ক্ষণেকের জন্য

আড়ষ্ট হয়ে পড়তো, পরক্ষণেই লাফিয়ে পালাতো। একবার তো তাঁর একজন সঙ্গী তিনটি মা-হারাণো কাঠবিড়ালীর বাচ্চাকে কুড়িয়ে আনলো। তাদেরকে ফাউন্টেন-পেনের কালি-ভরবার 'ড্রপার' দিয়ে দুধ খাওয়ানোই দিনের মধ্যে বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো।

সেলের দরজার উপর একজোড়া ময়না বাসা বেঁধেছিল। পণ্ডিতজী প্রতিদিন সকালে বিকালে তাদের খাবার দিতেন। কোনদিন খাবার দিতে দেরী হলে তারা পণ্ডিতজীর কাছে এসে কিচির মিচির করে আহারের দাবী জানাতো।

পণ্ডিতজী দেখতেন : টিকটিকি শিকার ধরেছে, বাইরের প্রাঙ্গনে টিয়াপাখীর লড়াই চলেছে, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁসের ঝাঁক। কানে ভেসে আসতো কোকিলের তান ও পাপিয়ার অবিশ্রান্ত সুর।

বর্ষার দিনে দু-একটি কাঁকড়া-বিছা চোখে পড়তো। কখন বা বিছানায়, কখন বা বইয়ের উপর। একবার একটা কালো বিছাকে ধরে তিনি বোতলে ভরে রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে তাকে মাছি ধরে খেতে দিতেন। একদিন কি যেন খেয়াল হোল, একটা সূতা দিয়ে বেঁধে তাকে দেয়ালে ছেড়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখেন যে সূতা কেটে সে পালিয়েছে। ভয় হোল, তন্ন তন্ন করে সমস্ত দেয়াল খুঁজলেন কিন্তু আর তার দেখা পেলেন না।

এদিক ওদিকে দু'চারটে সাপও চোখে পড়েছে।

কেঁচো দেখলেই ঘৃণায় সর্বাঙ্গ শিউরে উঠতো।

একটা বিড়ালের সঙ্গে কিছুদিন বেশ ভাব জমেছিল।

তারপর একটা কুকুর বেশ পোষ মানে। কুকুরটির অনেকগুলি বাচ্চা হয়। একটা বাচ্চার একসময় অসুখ করে। রাত্রে দশ বারোবার উঠে পণ্ডিতজী সেই বাচ্চাটির দিকে নজর রাখতেন। তাঁর যত্নে ও সেবায় বাচ্চাটি বেঁচে গেল। পণ্ডিতজী খুসী হলেন।

সহসা একদিন সংবাদ এল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ করে গান্ধিজী

আমরণ অনশন করেছেন। পণ্ডিতজী চমকে উঠলেন। দীর্ঘ হ'টি দিন তিনি ভালো করে কিছু ভাবতে পারলেন না, শুধু একটি কথাই তাঁর মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো—এক বছর আগে গোলটেবিল-বৈঠকে যাবার সময় গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, আর কি দেখা হবে না? মন নিরাশায় ভরে উঠে! মেজাজ বিগড়ে গেল সকলের উপর, সব কিছুর উপরেই রাগ হতে লাগলো।

এমন দিনে' গান্ধিজীর এক টেলিগ্রাম এলো—

'এই কদিন যাতনার মধ্যেও তুমি আমার মনশ্চক্ষুর সামনে রহেছ। তোমার মতামত জানার জন্য আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত আছি। তোমার মত আমার কাছে কত মূল্যবান তা তুমি জান। ইন্দু ও স্বরূপের (ইন্দিরা নেহেরু ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত) ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ইন্দুকে বেশ খুসি বলে মনে হোল। তার শরীরও একটু মোটা হয়েছে। অমি ভালই আছি। তারে উত্তর দিও। ভালবাসা জেনো।'

জহরলাল বিস্মিত হলেন, যে মানুষটির অনশন সারা ভারতের চল্লিশ কোটি জনগণের মাঝে বিক্ষোভ ঘনিয়ে তুলেছে, তিনি তখন অতি সাধারণ মানুষের মত তাঁর পারিবারিক জীবনের কথা শোনাচ্ছেন, জানাচ্ছেন—তাঁর মেয়ে ইন্দিরা একটু মোটা হয়েছে। বিপ্লবী নায়কের অপূর্ব মননশীলতা!

জেল-সুপারের অনুমতি নিয়ে পণ্ডিতজী তারে উত্তর দিলেন:

'আপনার তার পেলাম। মীমাংসা হয়ে গেছে শুনে আমি আশ্বস্ত ও আনন্দিত হলাম। আপনার উপবাসের সংকল্প শুনে আমি মর্মাহত ও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম শেষে আশার উপর নির্ভর করে আমার মন শান্ত হয়েছিল। নির্যাতিত পদদলিত শ্রেণীর জন্য কোন স্বার্থত্যাগই বড় নয়। সবচেয়ে নীচে যারা আছে তাদের স্বাধীনতা দিয়েই স্বাধীনতার বিচার করতে হবে। কিন্তু আশঙ্কা হয় অন্যান্য সমস্যায় হয়তো আমাদের লক্ষ্য অস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করতে আমি অক্ষম। আপনার প্রদর্শিত পন্থার অপরে সুযোগ

গ্রহণ করবে বলে আশঙ্কা হয়। কিন্তু যাদুকরকে আমি কি উপদেশ দেব। প্রণাম জানবেন।'

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্তন হোল, গান্ধিজীর অনশন ভঙ্গের সংবাদ এলো। পণ্ডিতজী খুসী হলেন।

ক'মাস পরে আবার এলো গান্ধিজীর একুশ দিনের অনশনের সংবাদ ও তারই সঙ্গে একখানি চিঠি। পণ্ডিতজী তার উত্তরে টেলিগ্রাম করলেন:
'আপনার চিঠি পেলাম, যা আমি বুঝি না, সে সম্পর্কে আমি কি বলবো? আমি যেন কোন অজ্ঞাত দেশে হারিয়ে গেছি, সেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আমি অন্ধকারে হাতড়ে এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু পদস্খলন হচ্ছে। যা-ই ঘটুক, আমার অনুরাগ ও চিন্তা আপনার অভিমুখীন রইল।'

অভিভূত হয়ে ভাবতে ভাবতে সহসা পণ্ডিতজীর মনে হোল, গান্ধিজীর কাজে তাঁর যত অসম্মতিই থাক না কেন, সাধ্যমত তাঁর সন্তোষ বিধান করাই এখন কর্তব্য, তাঁকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তিনি আবার এক টেলিগ্রাম করলেন গান্ধিজীর কাছে:

'আপনি এক্ষণে মহাপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমি আবার আপনাকে প্রেম ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি এখন স্পষ্ট বুঝেছি, যা-ই ঘটুক, তাতে কল্যাণই হবে এবং আপনার জয় অবধারিত।'

গান্ধিজী উপবাস কাটিয়ে উঠলেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর মনে তখন দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে—গান্ধিজীর নীতিই সম্যক্ রাজনীতি, না অন্য পথ আছে?

"....হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও।
নতশিরে প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি পরে

সন্থ জেগে উঠে কাল, সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।” [—রবীন্দ্রনাথ]

কিছুদিন পরে গান্ধিজী কারাগারের ভিতর থেকেই হরিজন আন্দোলন চালাবার সুবিধার দাবী জানিয়ে আবার অনশন সুরু করলেন। পণ্ডিতজী খবর পেলেন তাঁর অবস্থা মন্দের দিকে যাচ্ছে। তিনি বাঁচার ইচ্ছা ত্যাগ করেছেন।

ইতিমধ্যে মায়ের গুরুতর পীড়ার অজুহাতে গবর্মেণ্ট পণ্ডিতজীকে ছেড়ে দিলেন। তখনও কারাবাস শেষ হতে তেরো দিন বাকী ছিল।

—সাত—

পাঁচ মাস তেরো দিন বাদে এলাহাবাদের বাড়ীতে পুলিশ গিয়ে পণ্ডিতজীকে গ্রেপ্তার করলো।

সেখান থেকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি জেল।

আবার দু' বছর করাবাস।

আলীপুর জেলখানার দশ ফীট লম্বা, ন ফীট চওড়া একটি সেল। সামনে একটি বারান্দা এবং ছোট্ট উঠান। উঠানের পরেই সাত ফীট উঁচু এক পাঁচীল। পাঁচীলের ও দিকে নানা ধরনের ছোট বড় বাড়ীগুলির ছাদ চোখে পড়ে, ও-গুলিও জেলের মধ্যে এক একখানি বাড়ী। উঠানের ওপাশেই জেলের রন্ধনশালা। তার দুটি চিম্‌নী দিয়ে অবিশ্রান্ত ধোঁয়া বেরোয়। সময় সময় সেই ধোঁয়া এসে ঢোকে সেলের মধ্যে; পণ্ডিতজীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

সমস্ত উঠানটী শান-বাঁধানো। পাঁচীলের ওপাশে দুটী গাছের মাথা দেখা যায়। একটী গাছে একটী চিলের বাসায় অনেকগুলি বাচ্চা চিঁ চিঁ করে।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেলে তালা বন্ধ থাকে। লেখাপড়া করতে করতে বিরক্তি এলে সেই ছোট ঘরখানির মধ্যেই পণ্ডিতজী পদচারণা করেন,

গরাদগুলির পানে তাকিয়ে মনে হয় চিড়িয়াখানার ভল্লুকগুলোও এমনিভাবে ছোট পিজ্ঁরার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। যখন আর বেড়াতেও ভালো লাগে না তখন মাথাটি নীচের দিকে রেখে পা দুটী উপরে করে কিছুক্ষণ 'শিরাসন' করেন।

সন্ধ্যার পর সেলে বসে বসেই শোনা যায় পথের ট্রামগাড়ীর শব্দ, রেডিওর দূরাগত সঙ্গীত। তারপর রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জেগে ওঠে শান্ত্রীর চীৎকার ও পদধ্বনি। মাঝে মাঝে কর্মচারীরা লণ্ঠনের আলো ফেলে দেখতেন পণ্ডিতজী সেলে আছেন কিনা। বিরক্তি চরমে উঠতো শেষ রাত্রে। রাত তিনটে বাজলেই রান্নাঘরের কাজ সুরু হোত, পাঁচীলের ওপাশ থেকে শোনা যেত বাসন মাজা-ঘষার তুমুল শব্দ।

"একবার তোরে দেখেছি যখন কেমনে এড়াবি মোরে।
চাও নাহি চাও, ডাকো নাই ডাকো,
কাছেতে আমার থাকো নাই থাকো,
যাব সাথে সাথে, রবো পায় পায়,
রবো গায় গায় মিশি ;
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ
এই নৈরাশ, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্যের মতন বাজিবে
সাথে সাথে দিবানিশি।....
দুর্ভাবনার মতন নিয়ত তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রাত্রি এ মুখ দেখিব তোমার অশ্রুনীরে। [—রবীন্দ্রনাথ]

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সবই সহে গেল। মন গিয়ে পড়লো জেলখানার পাঁচীলের বাহিরে। 'সাপ্তাহিক ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' ও 'সাপ্তাহিক ম্যাঞ্চেষ্টার' কাগজ দু'খানি তিনি পড়তে পেলেন, তা থেকেই দেশবিদেশের নানা সমস্যায় তাঁর মনোজগৎ ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো।

জেল-সুপার একদিন এসে বললেন—মিষ্টার গান্ধী আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন।

সাপ্তাহিক ষ্টেট্স্‌ম্যানে পণ্ডিতজী পড়লেন গান্ধিজীর বিবৃতি, এবং সেই বিবৃতির শেষে গান্ধিজীর উপদেশ :

'তারা (কর্মীরা) আত্মত্যাগ ও স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্রের রীতি ও সৌন্দর্য অবশ্য শিক্ষা করবেন। তাঁরা অবশ্যই জাতি সংগঠনের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করবেন, এবং এই পদ্ধতি হচ্ছে—নিজ হাতে সূতা কাটা ও সূতা বুনে খদ্দর প্রচার, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্দ্যনীয় আচরণের দ্বারা অকৃত্রিম সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রসার, ব্যক্তিগত জীবনে সব রকমের অস্পৃশ্যতা পরিহার মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন—বিভিন্ন নেশাসক্তের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে এবং সাধারণতঃ স্বকীয় পবিত্রতা অনুশীলন করে মাদক দ্রব্য বর্জন প্রচার, এই সমস্ত কাজ ও সেবার দ্বারাই দরিদ্রের মত জীবনযাত্রা সম্ভব হবে। কিন্তু যাঁদের পক্ষে এই দরিদ্র জীবন সম্ভব নয়, তাঁরা জাতীয় উপযোগিতা সম্পন্ন ছোট ছোট শ্রমশিল্প—যে শিল্প এখনও সংগঠিত হয়নি, তাই অবলম্বন করতে পারেন, এতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী আয় হবে।'

জহরলাল পড়ে স্তম্ভিত হলেন। সহসা মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর জীবনের যোগসূত্র যেন হারিয়ে গেল। তখনকার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —"আলিপুর জেলের মধ্যে সহসা আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করতে লাগলাম। জীবন তরুগুল্মহীন ঊষর মরুভূমির মত নীরস মনে হতে লাগলো। জীবনে যত কঠিন শিক্ষা পেয়েছি তার মধ্যে কঠিনতম এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক শিক্ষার সম্মুখীন হলাম, কোন চরম ব্যাপারে কারও উপর নির্ভর করা উচিত নয়। জীবনের পথে একাই চলা উচিত। অপরের উপর নির্ভর করাই আশাভঙ্গজনিত বেদনাকে আমন্ত্রন করে।"

ধীরে ধীরে মনকে শান্ত করার জন্য তিনি গান্ধিনীতির বিচার করতে· সুরু করলেন।

গ্রীষ্ম সুরু হতেই পণ্ডিতজীকে দেরাতুন জেলে বদলী করা হোল। সেই পুরাণো সেল, কিন্তু এবার তার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পাঁচীলটি আরো চার-পাঁচ ফীট উঁচু করা হয়েছে, সেই পাঁচীল পার হয়ে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গ আর চোখে পড়ে না। পূর্বের মত বাইরে ব্যায়াম করার অধিকারও আর রইল না। সময় সময় ইয়ার্ডের লৌহদ্বার খুলে একজন ওয়ার্ডার যাতায়াত করতো, চকিতে কয়েক মুহূর্তের জন্য পণ্ডিতজী বাহিরের শোভা দেখতে পেতেন—সবুজ মাঠ, গাছের শ্যামল শ্রী, মুক্তাবিন্দুর মত রৌদ্র-উজ্জ্বল বৃষ্টির ফোঁটাগুলি তাঁকে মুগ্ধ করতো।

এখানে পণ্ডিতজী দৈনিক সংবাদপত্র পেতেন। মনটা বাহিরের ঘটনার সঙ্গে আবার যুক্ত হয়ে পড়লো।

এবার পণ্ডিতজী তাঁর আত্মকাহিনী লিখতে সুরু করলেন।

"—লই তুলি'
তোমার স্বাক্ষর-আঁকা সেই ক্ষণগুলি,
দেখি তারা স্মৃতিমাঝে আছিল ছড়ায়ে
কত না ধুলির সাথে, আছিল জড়ায়ে
ক্ষণিকের কত তুচ্ছ সুখদুঃখ ঘিরে'॥" [—রবীন্দ্রনাথ]

কিন্তু লেখা বেশীদূর অগ্রসর হবার আগেই সহসা একদিন দেরাতুন থেকে তাঁকে এলাহাবাদে নিয়ে আশা হোল, অসুস্থ কমলা নেহেরুকে দেখার জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হোল।

কিন্তু সে শুধু এগারো দিনের জন্য। তারপর আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনা হোল জেলখানায়।

তিন সপ্তাহ পরে তাঁকে দেরাদুন থেকে নিয়ে যাওয়া হোল আলমোড়ায়। আলমোড়ার পথে মেঘচুম্বী পর্বতশ্রেণী, দেবদারু ও পাইনের বন; ছোট ছোট কুটীরের সারি, পাহাড়ের গায় ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র তাঁর মনের উপর স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দিল। মনে হোল, অনেক দিন পড়ে তিনি যেন পরিচিত বন্ধুর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাত্রির অন্ধকারে জ্যোৎস্নালোকিত তারকাখচিত আকাশের নীচে রহস্যময় পর্বতমালার নিষ্করুণ গাম্ভীর্যের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ভয় হয়!

আলমোড়ায় পণ্ডিতজীর ব্যারাকটি ছিল বড়—একান্ন ফীট লম্বা, সতেরো ফীট চওড়া কাঁচা ঘর। পনেরোটি জানালা ও একটি দরজা। উইয়ে-খাওয়া ছাদ থেকে অনবরত কুটো ও ধূলো ঝরে পড়তো। মেঝে অ-সমান। শীতের প্রাদুর্ভাবে চটের পর্দা দিয়ে জানালাগুলি ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। তবু সময়-সময় মেঘ এসে ঢুকতো ঘরের মাঝে, সব কিছু কুয়াসাচ্ছন্ন হয়ে উঠতো।

এখানে পণ্ডিতজী থাকতেন একা, আর তাঁর সাথে এক ঝাঁক চড়ুই পাখী থাকতো ভাঙ্গা ছাদের ফাটলে।

সকাল সাতটায় ব্যারাকের দরজা খোলা হোত। পণ্ডিতজী কিছুক্ষণ উঠানে বসে রোদ পোহাতেন। দূরে পাহাড়ের পানে অনিমেষ চোখে তাকিয়ে থাকতেন। তাকিয়ে থাকতেন সূর্য-করোজ্জ্বল মেঘগুলির পানে। মাঝে মাঝে দূরাগত মেঘগুলি তাঁকে স্পর্শ করে চলে যেত। দেবদারু-কুঞ্জের মর্মরধ্বনি ভেসে আসতো সমুদ্র-কল্লোলের মত।

শীত গিয়ে কখন বসন্ত আসে। রডোড্রেনডনগুচ্ছ পাহাড়ের গায় রক্তিম লালিত্য জাগায়, অন্তরাল থেকে ভেসে আসে বুলবুলির কূজন।

"নিখিলের পানে
আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।
যা পাইনি তাও থাক্, যা পেয়েছি তাও,
তুচ্ছ বলে যা চাইনি তাই মোরে দাও।" [—রবীন্দ্রনাথ]

কোন এক সময় পণ্ডিতজী ঘরে এসে বসেন, সুরু করেন আত্মজীবন থেকে অতীতকে উদ্ধার করতে। কাগজের উপর কালির আঁচড় টানতে টানতে দিনের আলো ম্লান হয়ে আসে। বেলা সাড়ে চারটের সময় আহার শেষ করতে হয়। পাঁচটায় আবার ঘরে তালা পড়ে। রাত্রির অন্ধকারে ঘনিয়ে আসে নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। দূরে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কত কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে গ্রেপ্তারের দিন মা কত ব্যাকুল হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, হয়তো মায়ের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দিন কাটে, সময়-অসময় কোন কয়েদীর সঙ্গে দেখা হলে, সে জিজ্ঞাসা করে—বাবুজী জুগ্‌লী কবে?

পণ্ডিতজী প্রথমে কথাটীর মানে বোঝেন না, পরে ওয়ার্ডারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন—জুগ্‌লী মানে রাজার জুবিলী। এই 'জুবিলী' কথাটার মানে কয়েদীদের কাছে অনেক কিছু। এই জুবিলি উপলক্ষ্যে তাদের কতজনের কারাদণ্ডের কতটা মকুব হবে, মুক্তিও পেতে পারে হয়তো কেউ। কয়েদীর জগৎ মুক্তি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। পণ্ডিতজীর মনেও তার প্রভাব এসে পড়ে, তিনিও ভাবেন কবে আবার তিনি সেই পরিচিত জনারণ্যের মাঝে ফিরে যেতে পারবেন।

সহসা একদিন—কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার সাড়ে পাঁচ মাস আগেই—কমলা নেহেরুর অসুস্থতার জন্য পণ্ডিতজীকে ছেড়ে দেওয়া হোল।

তারপর আবার একবার পণ্ডিতজীকে বন্দীজীবন যাপন করতে হয়েছিল। ৯ই অগষ্ট 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাদের বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। পণ্ডিতজীও তাঁদের একজন। দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালেই কেটে যায়। বন্দীবাসের মধ্যেই ভগ্নিপতি রণজিৎ পণ্ডিতকে তিনি হারান। সেই দুঃখবোধের রোজনাম্‌চা তিনি লেখেননি। জেলখানার সেই নিস্তরঙ্গ জীবনধারার মাঝে ভারতভূমির বৈশিষ্ট্য তিনি অনুধাবন করার চেষ্টা করেন। সেই মনস্বিতার প্রকাশ আমরা দেখি 'ডিস্‌কভারী অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে।

"অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী যাচ্ছি অজানায়
আমি শুধু একলা নেয়ে আমার শূন্য নায়।
নব নব পবনভরে, যাব দ্বীপ দ্বীপান্তরে
নেব তরী পূর্ণ ক'রে অপূর্ব ধন যত।
ভিখারী তোর ফিরবে যখন
ফিরবে রাজার মত।" [—রবীন্দ্রনাথ]

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের—

কারাগারের দিনগুলি

১৯৪২ সালের ১২ই আগষ্ট, রাত তখন দু'টো, পুলিশ এসে এলাহাবাদের আনন্দভবন ঘিরে ফেললো, ঘুম ভাঙিয়ে গ্রেপ্তার করলো বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে। রাত দুপুরেই তাঁকে এনে পৌঁছে দিল নৈনী জেলে।

এর আগেও বিজয়লক্ষ্মী কিছুদিন এখানে ছিলেন, সবই তাঁর পরিচিত। ব্যারাকের এক পাশে একটা বিছানা পেতে তিনি শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙলো তখন নিজেকে বড় ক্লান্ত বলে মনে হোল। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। শেষে লম্বরদারণী (ঝাড়ুদারণী) যখন এলো ব্যারাক ঝাঁট দিতে তখন তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। কলে তখন ভিড়, এক ঘণ্টা উঠানে পায়চারি করার পর স্নানের কল থেকে একটু মুখ ধোবার জল পেলেন। তারপর সেই দুপুরে কিছু কাঁচা খাবার এলো, কিন্তু কয়লা ছিল না, একজন কয়েদীর সাহায্যে কিছু কাঠকুটো জোগাড় করে রাঁধতে বসলেন। কিন্তু আগুন জ্বলতেই চায় না! কোন রকমে আধসিদ্ধ কিছু রান্না করে বিকাল চারটে অবধি ঘুমোলেন। সন্ধ্যা ছ'টার সময় জমাদারণী এসে ঘরে তালাবন্ধ করে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে সে আবার ফিরে এসে তালা খুলে দিল, বললো—হুকুম হয়েছে, ইচ্ছা করলে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বাইরে শুতে পারেন।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত বাইরে কিছুক্ষণ বেড়ালেন, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হোল। তারপর উঠানে বিছানা পেতে বই নিয়ে বসলেন। কিন্তু বইয়ের পাতার উপর তখন আর মন বসতে চায় না, নানা চিন্তায় কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বইয়ের পাতা থেকে চোখ চলে যায় আকাশের গায়, অসংখ্য তারার পানে তাকিয়ে নিজেকে আর একলা বলে মনে হোল না। পাঁচীলের ওপাশ থেকে ভেসে আসে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি। আলোটিকে ঘিরে উড়তে সুরু করে যত পোকা, গায়ে মাথায় এসে পড়ে। আলোটি নিবিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। রাত তখন প্রায় সাড়ে ন'টা।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে ঘুম ভেঙে গেল, দেখেন বৃষ্টিতে সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। আবার বিছানা তুলে আনতে হোল ভিতরে!

এই ভাবেই সুরু হোল শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বন্দীজীবন।

জেলখানার যে ব্যারাকে বিজয়লক্ষ্মীকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেটী বারো-চৌদ্দ জন থাকবার মত একখানি চৌকো ঘর। ঘরের দু'ধারেই দু'চার হাত অন্তর গরাদ দেওয়া, তারই মাঝে একটী গরাদ-দেওয়া দরজা। রাত্রে তাতে খিল বন্ধ করে চাবি দেওয়া হয়। ঘরের ভিতরেই একটা দিক উঁচু করে বাঁধানো, তালাবন্ধ হবার পর সেইটাই হয় 'ল্যাটরিন'। আসবাব-পত্রের মধ্যে ছিল শুধু একখানি জেলের খাট আর নড়বড়ে একটী লোহার টেবিল। ঘরটা কতদিন যে মেরামত হয়নি তা বলা কঠিন। মেঝেটা এমনি এবড়ো-খেবড়ো যে রাত্রে হাঁটতে গেলে হোঁচট না খেয়ে এক পা চলার উপায় নেই। ছাদের অবস্থাও সেই রকম, টালিগুলি এমনিভাবে সাজানো যে রোদ আর বৃষ্টি অবাধে এসে

পড়ে ঘরের মধ্যে। মাঝে মাঝে ছাদ থেকে রাবিশের চাঙ্‌ড়া খসে পড়ে, বিছানা ও মেঝে সব নোংরা হয়ে যায়।

গরমের দিনে বেলা যতো বাড়তো, সূর্য যতো মাথার উপর উঠতো, গরম ততো অসহনীয় হয়ে উঠতো। ঘামে সর্বাঙ্গ সপ্‌সপে হয়ে উঠতো, মনে হোত যেন তিনি ছোটখাটো একটা টার্কিশ-বাথে রয়েছেন। সেই সঙ্গে বাড়তো মাছির উৎপাত, আর তারই সঙ্গে অসংখ্য ছোট ছোট ডাঁশ। দিনে ও রাতে একটু স্বস্তি পাবার উপায় ছিল না! রাত্রে একদিকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওয়ার্ডারদের কয়েদী গোণার সাড়া, আরেক দিকে মশার ঝাঁক! দিনে যতক্ষণ শুয়ে থাকেন ততক্ষণ হাতপাখা চালাতে হয়, একটু তন্দ্রা এলে পাখাখানা যেই হাত থেকে খসে পড়ে, অমনি মাছির ঝাঁক মুখের উপর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটোছুটি আরম্ভ করে দেয়! তন্দ্রা টুটে যায়, চমকে উঠে আবার তিনি পাখা নাড়তে সুরু করেন। ভালোমত ঘুম না হওয়ার জন্য সারাক্ষণ মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে।

গ্রীষ্মের পর আসে বর্ষা। শতছিদ্র ছাদ দিয়ে জলধারা নেবে আসে, বিছানাটা রাখার মত জায়গা থাকে না। সমস্ত ব্যারাকটা একটা হ্রদের মত দেখায়, বিছানাটা যেন তারই মধ্যে একটা দ্বীপ। তার উপর বাড়ে পোকার উপদ্রব। ব্যাঙ্‌গুলি ডেকে চলে অবিশ্রান্ত, তাদের ঐক্যতানে মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হবার উপক্রম হয়। একঘর জলের মাঝে ব্যাঙেরা দিব্যি লাফালাফি করে বেড়ায়। একদিন বিছানা থেকে নাবতে গিয়ে বিজয়লক্ষ্মী একটা ব্যাঙ্‌কে মারিয়ে ফেলেছিলেন।

তারপর ছিল ইঁদুর, বিড়াল, পিঁপড়া ও উই। বড় ইঁদুরগুলি বিড়ালকে ভয় করতো না। বিড়াল সুবিধা পেলেই দুধ চুরি করে খেয়ে যেত। পিঁপড়ার উপদ্রবে চায়ের জন্য চিনি রাখা চলতো না, উইপোকার দল যা পেত তাই কাটতো। একদিন তো ফলের ঝুড়ি কেটে আধখানা আপেল ও খানিকটা বাতাবিলেবু শেষ করে দিয়ে গিয়েছিল।

একদিন রাত দু'টোর সময় হঠাৎ সোরগোল পড়ে গেল—সাপ বেরিয়েছে। টর্চ জ্বেলে দেখলেন ঃ ব্যারাকের বাইরের দেয়ালে হাত দুয়েক লম্বা সরু ছাই-রঙা বিষাক্ত একটা সাপ। সাপটা পৌনে চারটে পর্যন্ত ওইখানেই পড়ে রইল, পাহারাদার সিপাই কিছুই করলো না। তারপর সাপটি কোথায় চলে গেল, গরাদের ফাঁক দিয়ে আর দেখা গেল না।

একদল বাদুড়ও থাকতো ঘরের মধ্যে। একবার তো কন্যা লেখা রাত আড়াইটের সময় চীৎকার করে উঠলো। ছাদ থেকে একটা বাদুড় এসে পড়েছিল একেবারে তার বুকের ওপর। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত সেটাকে তাড়িয়ে দিলেন বটে, কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘরময় সেটা ঘুরতে লাগলো, সারা রাত কেউ আর ঘুমুতে পারলেন না।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত নিজের খাবার নিজেই রান্না করে নিতেন। কারণ জেলখানার খাবার ছিল অতি কদর্য। ডাল মানে লাল লংকা-ভাসানো নোংরা খানিকটা জলমাত্র। তরকারী! —দেখতেও যেমন খেতেও তেমন, তার উপর বালি কাঁকর কিচ্‌কিচ্‌ করে। চা বলে যা দেওয়া হয় সেটা যে কি, তা নির্ণয় করা কঠিন।

বিজয়লক্ষ্মী ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী। দৈনিক ন' আনা করে তিনি পেতেন, তাই থেকেই তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করতে হোত। যে চাল ডাল তাঁকে দেওয়া হোত, তার ওজন বাড়াবার জন্য ছোট ছোট পাথরকুচি ও মাকড়সা থাকতো। যে ঘি তাঁকে দেওয়া হোত, তার রং ছিল গাঢ় বাদামী, গন্ধটাও বিশ্রী। যে কাঠ পেতেন তা ভিজে, আগুনের চেয়ে তাতে ধোঁয়াই হোত বেশী। সেই ধোঁয়ায় বসে রান্না করা মাঝে মাঝে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠতো। তরকারীর জন্য যে আলু আসতো, তা সবই পচা। ফল চাইলে দশ বারো দিনের আগে তা আর এসে পৌঁছাতো না। তারপর যা আসতো, তা হয় পচা, নয় শুকনো, না হয় থেঁৎলানো। একবার তাঁর বিরক্তি চরমে ওঠে,

ছ'টা থেঁৎলানো কলা আসামাত্রই ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। তার পরদিন আপিস থেকে চিঠি আসে—কলাগুলোর দাম দেবে কে?

বিজয়লক্ষ্মী উত্তর দেন—জেল দেবে।

তারপর আবার যখন ফল চান, কর্তারা বললো—কনট্রাক্টর বাজারে কোন ফল পাচ্ছে না।

বিজয়লক্ষ্মী লেখেন—কনট্রাক্টর যদি একটা জোচ্চোর বদমাস হয় তাহলে আমাকে তার হাতে মরতে হবে নাকি? ফল না পেলে আমি উপরওলার কাছে নালিশ জানাবো।

কাজ হোল। পরদিন কর্তারা দুটী চমৎকার কাশ্মীরী আপেল পাঠিয়ে দিল।

জেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকারও কোন সুবিধা ছিল না, ধূলায়-ধূলায় কাপড়ের রং হয়ে গিয়েছিল কফির মত, সাবান দিয়ে কাচলেও কাপড় আর ফরসা হোত না। তার উপর বর্ষাকালে চারিদিকে যখন ছাতা পড়তো, তখন পরনের জামা কাপড় থেকেও যেন একটা ভ্যাপ্সা গন্ধ উঠতো।

জেলখানার ক্লান্তিভরা তিক্ত দিনগুলি মনকে আছন্ন করে রাখে। শ্রীযুক্তা পণ্ডিত তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন: "দিনগুলো এখানে কাটতেই চায় না। আর জেলের রাতগুলো মনে হয় অন্য জায়গার চেয়ে কয়েক ঘণ্টা বড়। সময় যেন এখানে দীর্ঘতর হয়ে যায়। প্রত্যেক দিন যেন একটা মাস, প্রত্যেক মাস যেন একটা বছর। শেষ পর্যন্ত মনে হয় যেন একটা গোটা শতাব্দী কেটে গেছে। সুপারিনটেনডেণ্ট আমার জন্ম দিনে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার বয়স কত। বললাম—'জানি না। আমার মনে হয় যেন কত শতাব্দী আমার কেটে গেছে'। পরে মনে পড়লে এক জায়গায় পড়েছি—'কোনো ঘটিকাযন্ত্র, কোন ডায়েরীর দ্বারা সময়ের সত্যকার পরিমাপ হয় না, হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারাই শুধু তা মাপা যায়। হৃদয় মন যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সময়ও স্তব্ধ, অচল। হৃদয় যখন জাগ্রত

তখন উদ্বেগ, বেদনা, আকাঙ্খার তীব্রতায়, বারোটী ব্যর্থ জীবনে যা না পাওয়া যায় মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে তার চেয়ে অনেক বেশী অভিজ্ঞতা সম্ভব। সুদীর্ঘ সময় আমরা চাই না, আমরা শুধু চাই যে যেটুকু সময় আমাদের আছে, সমস্ত হৃদয় দিযে যেন তা উপভোগ করতে পারি।' এই 'সমস্ত হৃদয়ের উপভোগের দরুণই বোধ হয় এখন আমার মনে হচ্ছে যেন বহু শতাব্দী ধরে আমি বেঁচে আছি।"

মনে জাগে একটী কবিতার কয়েক ছত্র ঃ

"বন্ধু আমাদের নেই, প্রিয়াও নয়
সম্পদ ও সুখের বাসা আমরা জানি না,
শুধু পথের আর এক প্রান্তে ভগবানের যে নগর
তারই আশায় আমরা যাত্রা করেছি।
শান্তি, সুখ ও আরাম তো আমাদের জন্য নয়,
কারণ যে নগর আমরা কোনদিন খুঁজে পাব না
তারই সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি।
গুপ্ত নগর কোনদিন চোখে দেখবার নয়
তাই আবিষ্কার করতে আমাদের মত যারা বেরিয়েছে
পৃথিবীতে কোন সান্ত্বনা তারা পাবে না।
আমাদের শুধু পথ আর উষালোক
আর রোদ, ঝড় ও বৃষ্টি,
তারকাময় আকাশের তলায় পাহারা জাগার আগুন
আবার ঘুম আর আবার সেই অন্তহীন চলা।"

মাঝে মাঝে সামনের পাঁচীলের প্রকাণ্ড লোহার কপাট খুলে যেত, কেউ হয়তো বাহিরে যেত, নাহয় কেউ আসতো ভিতরে। সেই ফাঁক দিয়ে ক্ষণেকের জন্য দেখা যেত সবুজ ঘাস, পথের একটা টুকরো,—মুহূর্তেকের জন্য বাহিরের

পৃথিবীর সংগে একটা যোগাযোগ ঘটতো, মনের মাঝে জাগতো একটা চকিত আনন্দবোধ।

সন্ধ্যাবেলা কিছু আর ভালো লাগতো না। গরাদের পাশে বসে বাহিরের পানে চেয়ে থাকতেন। অনন্ত নীল আকাশের মাঝে উদাস দৃষ্টি হারিয়ে যেত। খণ্ড খণ্ড মেঘগুলির উপর ভর দিয়ে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে আকাশের গায়, তারাগুলি ঝিলমিল করে উঠে। রহস্যময় অন্ধকার অপরূপ হয়ে ওঠে, দেখতে ভালো লাগে। তারপর কোন একসময় চোখ যখন নেবে আসে বাহিরের দেয়ালটার গায়, মনে হয় দিনের বেলার চেয়ে সেটা যেন এখন আরো বিরাট আরো ভীষণ হয়ে উঠেছে। ওটা যেন একটা বিরাট মখমলের কালো পর্দা, আমাদের দৃষ্টিকে বাহিরে থেকে আড়াল করে রেখেছে।

শান-বাঁধানো কঠিন পরিবেশকে একটু রঙীন মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য শ্রীযুক্তা পণ্ডিত সামনের ছোট উঠানটিতে একটা ছোটখাট ফুলবাগান করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিছুদিনের চেষ্টাতেই গাছগুলি বড় হোল, ফুল ফুটতে সুরু করলো। অতি সাধারণ ফুল, তবু এই রঙীন ফুল ও সবুজ গাছগুলির পাশে এসে দাঁড়ালে মনটা স্নিগ্ধ হয়ে উঠতো।

পরিবেশ আরো একটু সহনীয় হয়ে উঠলো বড়মেয়ে লেখা ও ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরার আগমনে। আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তাদেরও জেল হয়েছে। তারপরেই এলো ক'জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, পাশে পুরুষদের ব্যারাকে এলেন স্বামী রণজিৎ পণ্ডিত। মেয়েরা পরিবেশকে হাল্কা করে তুললো, ব্যারাকের এক এক অংশের এক একটা নামকরণ করলো। ইন্দিরার শোবার জায়গার নাম দেওয়া হোল 'শিম্বোরাজো', লেখার জায়গাটার নাম হয়েছিল 'রিয়াভেন্তু' অর্থাৎ সুন্দর দৃশ্য, কারণ এখান থেকে বাহিরের দরজাটা দেখা যায়, বিজয়-লক্ষ্মীর স্থানটির নাম হয়েছিল 'ওয়াল্‌ভিউ' কারণ সামনেই উঁচু পাঁচীল। মাঝে একটা পুরাণো নীল কম্বল পাতা থাকতো, তার উপর বসে খাওয়া-দাওয়া,

পড়াশুনা, আলাপ-আলোচনা চলতো, সেইটুকুর নাম হোল—'নীল মজলীশ', বিড়ালটার নাম দেওয়া হোল, 'মহিতাবেল'। লণ্ঠনটার নাম হোল 'লুসিফার', তেলের শিশিটার মাথা ভেঙে গিয়েছিল, তার নাম দেওয়া হোল, 'রূপার্ট মাথাকাটা আর্ল'। সন্ধ্যার পর তাঁরা মাঝে মাঝে এক একখানি নাটক নিয়ে বসতেন, এক একজন এক একটি ভূমিকা সুরু করতেন পড়তে, বিজয়লক্ষ্মী শুনতেন, আনন্দ পেতেন। চৌদ্দদিন পর পর এক একবার দেখা করতে পেতেন স্বামীর সঙ্গে, তাঁর কথায় মনে সাহস আসতো, কারাভোগের অবসাদকে জয় করার মত দৃঢ়তা পেতেন। তবু এক একসময় মনে হোত, নিজের জীবনের ছোট বড় কাহিনীগুলি দিয়ে গল্পের এক মালা গেঁথে যান, তার নাম দেবেন 'বন্ধ দরজার করুণ কাহিনী'।

কারাগারের অনেকখানি সময় তিনি কাটাতেন বই পড়ে। অনেক বই তিনি পড়েন, তার মধ্যে তাঁকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছিল—বিশ্ববিখ্যাত লোকদের চিঠির এক সঙ্কলন, বার্ণার্ড শ'র নাটক 'এসকেপ ফ্রম ফ্রীডম্', টমাস ব্রাউনের লেখা হাসির নাটক 'ড্রইংরুম' লরেন্স হাউসম্যানের আত্মজীবনী 'দি আন-এক্স্‌পেক্‌টেড ইয়ার্স', আপটন সিনক্লেয়ারের 'ড্রাগন্‌স্ টীথ', সাময়িক পত্র 'লাইফ' ও মাসিক 'মডার্ণ রিভিয়ু'।

কারাগারের পরিমণ্ডল ও কৃচ্ছ্রতা এবার আর তাঁর সয় না। দশ মাসের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার ওষুধ দেয় বটে কিন্তু ফল কিছু পাওয়া যায় না। শেষে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ দেশের জেলখানা সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা পণ্ডিত লিখেছেন: "ঘুষ যে কি পরিমাণে এখানে চলে ভাবলে গা রি রি করে উঠে। ঘুষের নানান ফিকির আছে, কখনো কখনো খোলাখুলি ভাবেই দেওয়া হয়। জেফ্রে মৈনশূল বলেন—'জেলখানা হোল মানুষকে জ্যান্ত কবর দেবার জায়গা।....জেল একটা সংক্ষিপ্ত বিশ্ব, দুঃখের রাজ্য, বেদনার মানচিত্র। ঝোঁক থাকলে কোন ছেলে ছ' মাসে এখানে এতো বদমাইসিতে পাকা হতে পারে, যা কুড়িটি 'বোল' খেলবার জুয়ার আড্ডা,

পতিতালয় বা সাধারণ কোন জায়গায় সম্ভব নয়।....প্লেগের সময় রুগীদের আস্তানায় যত না রোগের সন্ধান পাওয়া যায় এখানে রোগ তার চেয়ে অনেক বেশী, আর গরমের দিনে লর্ড-মেয়রের কুকুরশালে এত দুর্গন্ধ হয় না'....কর্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।....ওয়ার্ডারণীরাই সবচেয়ে দোষী। এ সব কাজে উপযুক্ত লোক যতদিন না নেওয়া হবে, এবং মেট্রন যতদিন না কাজের সম্পূর্ণ যোগ্য হবে, ততদিন সত্যিকার কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না। নরকের কারাগারগুলো কি রকম আমি অবশ্য জানি না, তবে শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে যদি পৌঁছাই তাহলে বৃটিশ ভারতের জেলগুলোর যে অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি, তা থেকে শয়তানকে নরকের কারাগারের উন্নতি করবার বেশ দু'চারটে মতলব বাতলে দিতে পারবো। জেলার, মেট্রন, ওয়ার্ডারণী প্রভৃতি কয়েকজন যোগ্য লোকের হয়ে তার কাছে সুপারিশ করতে পারবো।"

কৃষ্ণা হাতিসিংয়ের—

কারাবাসের স্মৃতি

১৯৩২ সালের ২৬শে জানুয়ারী এক সভায় যোগ দেবার জন্য পরদিন সকালে পুলিশ কৃষ্ণাকে গ্রেপ্তার করে। বড় বোন বিজয়-লক্ষ্মীও বাদ যাননি। দু' বোনের সশ্রম কারাদণ্ড হোল এক বছরের জন্য।

বিচারের আগে তিন সপ্তাহ তাঁকে হাজতে থাকতে হয়েছিল, এক একটি ঘরে বারজন করে মেয়ে-কয়েদী থাকতো—নানা কদর্য রোগগ্রস্ত যত কদর্য স্ত্রীলোক। সঙ্গী হিসাবে তারা মোটেই লোভনীয় নয়। তার উপর ঘরগুলো ছিল হরেক রকম পোকার আস্তানা। পোকাগুলো কিলবিল করে ঘুরতো ঘরের মাঝে। রাত্রের অন্ধকারে কখন্ তারা গায়ে এসে পড়ে, কখন্ বিছানায় এসে ওঠে—সেই কথা ভেবে সারা গা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠতো, রাত্রে ঘুম হোত না।

সেখান থেকে লখ্নৌ জেল।

জেলে ঢুকতেই মেট্রন বলে দিল কি কি করতে হবে, কি ভাবে থাকতে হবে ইত্যাদি জানিয়ে দিল—সামনে উঠানটায় তাঁরা বেড়াতে পারেন, কিন্তু পাঁচটা

পর্যন্ত। পাঁচটার সময় সবাইকে ব্যারাকে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করা হয়। বিকাল পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল পাঁচটা অবধি তলাবন্ধ হয়ে থাকতে হবে শুনে মনটা প্রথমেই খুব দমে গেল।

জেলের ব্যবস্থা সম্পর্কে কৃষ্ণা লিখেছেন—"প্রত্যেকের ছ'খানা শাড়ী আর অন্য পরিধেয় যৎসামান্য বরাদ্দ। নিজেদের কাপড়-চোপড় নিজেদেরই কাচতে হোত, সেটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। কারণ মোটা পুরু খদ্দর, জলে ভিজে দ্বিগুণ ভারী হয়, নিঙড়ানো শক্ত। জেলে অন্যান্য অনেক কিছুর মতো, এতেও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। কিন্তু খাবার কিছুতেই গলা দিয়ে নামে না। শুধু খারাপ বলে নয়; পরিবেশন এমন নোংরা যে দেখলে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। প্রস্তাব পাঠানো হোল—আমরা নিজেরা রেঁধে খাব। অনুমতি মিললো। চারজন আর ছ'জনের এক এক দল রাঁধে পালা করে, আমরা একজন রাঁধতাম, —একজন তরকারি কুটতাম, আর বাকী ক'জন মাজতাম বাসন-পত্র। এই ব্যবস্থায় একটু যেন স্থবিধা হোল। আমাদের ব্যারাকে দশজন, কখনো বারোজন জমে যেত। সারাদিন ঘুরে বেড়াই উঠানে কিন্তু পাঁচটা বাজলেই তালাবন্ধ। সকালে আবার উন্মোচন। সময়টা আর কিছুতেই কাটে না। কেউ কথা বলতে চাই, কেউ চাই পড়তে, কেউ চাই আলোচনা করতে, কেউ গান করবে—মোট কথা সবাই ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে কষ্ট ভুলে থাকতে চাই। মাঝে মাঝে পরস্পরের উপর বিরক্ত হয়ে উঠতাম; তবে মোটামুটি মন্দ কাটতো না।"

পনেরোদিন দিন অন্তর একখানি চিঠি লিখতে পারতেন।

এক সঙ্গে ছ'খানি করে বই পড়তে পেতেন, তবে বই চাওয়ামাত্রই পাওয়া যেত না, প্রথমে তিনি যে সব বই চেয়েছিলেন, দু'মাস পরে সেগুলি তিনি পান! শ্রীযুক্তা কৃষ্ণার বইয়ের লিষ্ট দেখে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট প্রথমে গম্ভীরভাবে বলেছিলেন —আপনার জন্য জেলের মধ্যে একটি গ্রন্থাগার খুললেই ভালো হয় না কি?

কৃষ্ণাও উত্তর দিয়েছিলেন—আপনার বিশেষ কষ্ট না হলে সে তো খুব ভালোই হয়!

শীতকালটা জেলে কষ্টেই কেটেছিল, ব্যারাকের দরজা জানালা বলে কিছু ছিল না, লোহার গরাদ দিয়ে সারারাত হু হু করে হিম আসতো।

গ্রীষ্মকালে আবার আরো বেশী কষ্ট, সমস্ত দুপুরবেলা লু বইতো।

প্রাকৃতিক অত্যাচার যদি বা সহ্য যেত প্রহরিণীদের অনাচার হয়ে উঠতো অসহ্য, অনেক সময় মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে উঠতো।

একদিন গভীর রাতে সহসা পাশের মেয়েটি কৃষ্ণাকে জাগিয়ে দিল, বললো—শুনতে পাচ্ছ?

কৃষ্ণা শুনতে পেলেন দূর থেকে অস্পষ্ট মৃদু ঘুঙুরের আওয়াজ ভেসে আসছে, জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের শব্দ?

—জানি না, কিন্তু বড় ভয় করছে। একটা নাচওয়ালী ছিল এখানে, তার ফাঁসী হয়। তারই প্রেতাত্মা হয়তো ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনো।

—পাগল নাকি? জেলে কখনও ভূত আসতে পারে?

—না, পারে না! তাহলে ও শব্দটা কিসের শুনি?

কৃষ্ণা আর কি বলবেন, কান পেতে শুনতে লাগলেন, শব্দটা ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে পড়ে রইলেন, ভয়ে আর কারুর চোখে ঘুম আসে না।

পরের দিনও ঠিক সেই সময় সেই ঘুঙুরের আওয়াজ। দূর থেকে ক্রমশঃ যেন কাছে এলো, তারপর আবার দূরে মিলিয়ে গেল। ভূতের ভয়ে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

চতুর্থ রাত্রে যেদিক থেকে ঘুঙুরের শব্দ আসছে, সেইদিক পানে তাকিয়ে রইলেন। কোন্ এক সময় চোখে পড়লো কালো একটা মানুষের ছায়া

ব্যারাকের কোণ ঘুরে চলে গেল। প্রেতাত্মা নাকি? ভয়ে কাঠ হয়ে কিছুক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলেন, তারপর মনে পড়লো—প্রহরিণীরা তো কালো পোষাক পরে রাত্রে কয়েদী গুণতে বাহির হয়, তাদের কোমরে থাকে ব্যারাকের চাবির গোছা, প্রতি পদক্ষেপে সেই চাবিগুলি বেজে ওঠে ঘুঙুরের মত। মুহূর্তমধ্যে সমস্ত ভয় ভেঙে গেল, কৃষ্ণা নিশ্চিন্ত হলেন।

পরদিন সকালে কথা পাড়তেই, আর সবাই বললো—আমরাও শুনেছি ওই শব্দ!. ও প্রেতাত্মা।

আসল কথা বললেও তারা কি আর সহজে বিশ্বাস করতে পারে!

জেল জীবনে একটী মেয়ে কৃষ্ণার স্মরণীয় হয়ে আছে—সে বাচুলি।

"বাচুলি বলে একটি মেয়েকে ভারী ভালো লাগতো আমার। মোটাসোটা কাঁধ-পর্যন্ত-নেমে-আসা চুল জট বেঁধে রুক্ষ হয়ে এসেছে। ছাই রঙের চোখ; বেশী লম্বা নয়। দেখতে বেশ। তার এই রুক্ষ কাপড়-চোপড়, অপরিচ্ছন্ন চেহারা সত্ত্বেও তাকে প্রথম যখন দেখলাম জেলের কারখানায় সে বুনতে শিখছে, তখন বেশ দেখাচ্ছিল তাকে; এতো ছেলেমানুষ যে,—মুখের চেহারায় এমন নির্দোষ ছাপ যে ভেবেই উঠতে পারলাম না ও কেন এখানে এসেছে, কিই-বা বিরাট অপরাধ করেছে ওই নিতান্ত শিশু! তার কাছাকাছি যেতেই কানে এলো আপনমনে সে গান গাইছে। উত্তর ভারতবর্ষের পাহাড়িয়াদের মুখে শুনেছি এই করুণ সুর; ভারি পেয়ে বসে। জিগ্‌গেস করলাম—তোমার নাম কি?

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে সেও দ্বিধাভরে জিগ্‌গেস করলো—তুমি কে, এখানে এলে কি করে?

উত্তরে বললাম—আমিও একজন কয়েদী।

সে হেসে উঠলো, জিগ্‌গেস করলো—কি করেছিলে?

—আমি রাজনৈতিক বন্দী।

সে মাথা নাড়লো বটে তবে কথাটা ভালো করে বুঝলে কি না সন্দেহ। যাই হোক সে বুঝলো আমি আলাপ করতে চাইছি এবং আমি কোন জেল কর্মচারী নই। নাম বললো নিজের। লজ্জাভরে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হেসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে আবার শুরু করলো কাজ।

—তুমি এখানে কেন, বাচুলি?—জিগ্‌গেস করলাম।

বড় বড় সরল চোখে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে সে শুধু বললো—খুনের দায়ে।

বিশ্বাস হোল না।....এখনও এতো ছেলেমানুষ; এ খুন করলো কি করে? নিশ্চয়ই কোনো ভুল হয়েছে কোনোখানে।"

বাচুলি রাগের মাথায় তার ঘুমন্ত স্বামীর গলায় রুমালের ফাঁস টেনে দিয়েছিল, স্বামী যে মরে যাবে, তার পরিণাম কি হবে এসব কথা সে ভাবতেও পারে নি। স্বামী প্রহার করতো, সেই ছিল তার রাগ। স্বামীর মৃত্যুর পর সে ঘর ছেড়ে পালায়ও নি।

বিচারে তার যাবজ্জীবন জেল হয়।

বাচুলির মুখের পানে তাকিয়ে কৃষ্ণার মন ব্যাথায় ভরে ওঠে: বয়স সবে পনেরো বছর মাত্র। এতো ছেলেমানুষ, জেলখানার মধ্যে এর জীবনটা কাটবে কেমন করে! জীবন সম্পর্কে কতটুকুই বা এর অভিজ্ঞতা! এই বয়সে সে এসে পড়েছে এই হীনতম অপরাধীদের পরিবেশে, শুনছে এদের কদর্যতম ভাষা। এরকম অপরাধের বিচার হওয়া উচিত ছিল অন্যভাবে, অন্যরকম শাস্তি! কুড়ি বছর বাদে জেল থেকে যখন এ বেরুবে, তখন কি হবে এর ভবিষ্যৎ?

ভালোভাবে থাকার জন্য পনেরো দিন আগেই কৃষ্ণা জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

—"শেষবারের মত ফিরে তাকালাম, সেই কঠিন ভীষণরূপী কারাগারের দিকে—কত অল্প বয়সের মানুষ জীবনের প্রারম্ভেই রুদ্ধ হয়ে রয়েছে এখানে। আমিও তো এক বছর কাটিয়ে এলাম। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ফটক—ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম আমাদের বিদায় জানাতে তখনো মেয়েরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। মনে করেছিলাম আমার চোখের জল তাদের দেখতে দেব না! কিন্তু তা হোল না। তারা হেসে বললো—'কি গো, জেল ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি ?' তারা তো জানতো না কেন আমাদের চোখে জল।....জেল এমন একটা কিছু প্রমোদপুরী নয় যে ছেড়ে আসতে আমার চোখে জল আসবে। চোখের জল ফেলেছিলাম ওই অসহায় মেয়ে ক'টীর জন্যে—ভুল করে, অজ্ঞানে অপরাধ করেছে যারা। নির্যাতনে, সমবেদনার অভাবে যে কাজ তারা করেছে, দারিদ্র, অবহেলা আর নিষ্ঠুরতাই তার জন্য দায়ী, তা না হলে এমন কাজ তারা কখনই করতো না। এই স্নেহের কাঙাল, শিশুর মতো সরল ছোট ছোট মেয়েদের জন্যেই মনে আমার বেদনা, বাড়ি ফিরে যাবার অনিচ্ছা। আমার বাড়ি আমায় সাড়ম্বরে সম্বর্ধনা করে নেবে, সাদরে গ্রহণ করে নেবে আমার বন্ধুবান্ধব প্রিয়জন, আর এদের ?—ভাবতেই পারি না কি হবে এদের !"

মহাত্মা গান্ধীর—

বন্দী-জীবন

সোমবার দিন সকাল বেলা একখানি মোটার এসে থামলো জেলের সামনে, প্রকাণ্ড লোহার ফটক ঝনঝন খনখন করে খুলে গেল, কটিবস্ত্র পরিহিত এক শীর্ণ বৃদ্ধকে গ্রাস করে, কপাট দু'খানি আবার পরস্পর যুক্ত হোল। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির কর্ম-মনীষা রাজদ্রোহের অপরাধে পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে সীমাবদ্ধ করা হোল।

গান্ধিজীর সঙ্গে ছিল একটি ফলের ঝুড়ী আর একটি চরকা। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললেন—চরকা আর ফলের ঝুড়ী কাছে রাখা চলবে না।

গান্ধিজী বললেন—সূতা কাটা আমার একটা ব্রত। সবরমতী জেলে আমাকে সূতা কাটতে দেওয়া হয়েছে।

সুপার বললেন—য়েরোড়া সবরমতী নয়।

সুপার ইঙ্গিত করলেন, ওয়ার্ডাররা চরকা নিয়ে চলে গেল।

মহাত্মাজী আর কোন কথা বললেন না। সেদিন তিনি জেলের অন্ন স্পর্শ করলেন না, একটা দিন উপবাসেই কেটে গেল।

সুপার ছুটে এলেন—ব্যাপার কি ?

গান্ধিজী বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করেছি প্রতিদিন অন্ততঃ আধ ঘণ্টা করে

সুতা কাটবো, সুতা কাটা বন্ধ হলে খাওয়াও বন্ধ হবে, কাজেই আমাকে আহার ছাড়তে হয়েছে।

সুপার দেখলেন ব্যাপার সহজ নয়, তখনই চরকা ফেরৎ দেবার আদেশ হোল।

জেলে একটি পরিদর্শক কমিটি থাকে, সপ্তাহে এক দিন তারা কয়েদীদের হালচাল দেখতে আসে। য়েরোড়া জেল পরিদর্শক কমিটি একদিন গান্ধিজীকে দেখতে এলো। তাদের মধ্যে একজন পাদ্রী ছিল, গান্ধিজী তাকে বললেন—আমার সঙ্গী শংকরলাল ব্যাংকারকেও আমার সঙ্গে গ্রেপ্তার করে এই জেলেই এনে রাখা হয়েছে। বেচারা অসুস্থ, স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে। তাকে আমার কাছে থাকতে দিলে ভালো হয়, বেচারাকে আমি দেখাশুনা করতে পারি!

পাদ্রী অবজ্ঞায় একবার মুখ ভেংচালো, গান্ধিজীর কথার কোন উত্তর দিল না। উত্তর দিল তার এক সংগী, বললো—যত সব আহাম্মুখী কথা!

মহাত্মাজী মনে বড় আঘাত পেলেন, ঘূর্ণ্যমান চরকার চাকাখানির পানে তাকালেন, তাকালেন, তূলোর পাঁজের পানে। চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো শংকরলালের মায়ের মুখখানি, মনের মাঝে উঁকি মারলো তাঁর মৃত্যুকালের কথাগুলি '—আপনার মত মানুষের হাতে ছেলেটাকে রেখে যাচ্ছি, বিদায়বেলায় এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা!' কিন্তু আজ দুর্বল রুগ্ন শংকরলালের জন্য তিনি কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারলেন? মানুষ কত অক্ষম, তার সামর্থ্য কত সীমাবদ্ধ! কারাগারের লোহার ফটকের পানে তাকিয়ে, সু-উচ্চ পাঁচীলের পানে তাকিয়ে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন শুধু।

জেলের জীবনে কোন বৈচিত্র্য নেই।

পূর্বাকাশে ঊষালোক ফুটে ওঠার আগেই গান্ধিজী ঘুম থেকে ওঠেন। স্নানাদি সেরে ছ'টা অবধি চলে স্তোত্রপাঠ।

প্রভাতী আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলে সুরু করেন পড়াশুনা। পুরা দুটি ঘণ্টা পড়াশুনা চলে। মাঝে মাঝে অবশ্য খাবার জন্য খানিকটা সময় কেটে যায়। তারপর চার ঘণ্টা চলে তুলো ধোনা, পাঁজ তৈরী করা আর সূতা কাটা।

ধীরে ধীরে দিনের আলো শেষ হয়ে আসে, সন্ধ্যার অন্ধকার চারিপাশ কালো করে দেয়। চোখের দৃষ্টি ম্লান হয়ে আসে, তিপ্পান্ন বছরের বৃদ্ধ চশমা খুলে হাত গুটিয়ে বসেন। কেউ তাঁর অন্ধকার কক্ষে একটি আলো দেয় না। নিঃসঙ্গ রাষ্ট্রনায়ক অন্ধকার কারাকক্ষে বসে কত কি ভাবেন। জানা চেনা কত মুখ ভেসে ওঠে চারিপাশের কালো যবনিকার উপর। চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ ভীড় করে আসে তাঁর মনে। অন্ধকারের মাঝে বসে মহাভারতের মহাস্থবির আলোর দিশা খোঁজেন হয়তো!

ঢং ঢং করে রাত্রি আটটার ঘণ্টা পড়ে, মহাত্মাজীর সমাধি টুটে যায়। ধীরে ধীরে তিনি রাত্রির প্রার্থনা আবৃত্তি করে শুয়ে পড়েন।

মহাত্মাজী যতই আত্মস্থ ও নির্বিরোধী হোন না কেন জেলের রূঢ়তা মাঝে মাঝে তাঁকে উত্যক্ত করে তোলে। একটি ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন:

"—সকল কয়েদীর মতো আমারও কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া কোন দ্রব্য দেহে লুকানো আছে কি না দেখিয়া লওয়া হইত। প্রতি সন্ধ্যায় এই প্রকার নিয়মমত 'ঝাড়তি' লওয়া হইত। আমি কখনও আপত্তি করি নাই? তখন আমার দেহে 'কচ্ছ' (ছোট বস্ত্র) ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবু জেলার আমার কোমর ও কোমরের নীচের ভাগ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতেন। একবার তো তিনি আমার কম্বল ও অন্যান্য জিনিষ উঠাইয়া উপর নীচে করিয়া দেখিলেন। জুতা পায়ে দিয়া আমার জলের বাসন স্পর্শ করিলেন। আমার অসহ্য বোধ হইল। তাঁহার সম্পর্কে রিপোর্ট করিব কি না সেই বিষয়ে ভাবিতে লাগিলাম।

রিপোর্ট করিলে তিনি খুব বকুনি খাইতেন। কিন্তু আমি রিপোর্ট না করাই স্থির করিলাম।”

আরেকবার গান্ধিজীর একখানি ছুরীর দরকার—রুটি কাটতে হবে, নেবু কাটতে হবে। সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে জানালেন—একখানি ছুরী দিন, না হলে রুটি খাওয়া ও নেবু খাওয়া বন্ধ করে দিতে হবে।

কিন্তু জেলের আইনে ছুরী এক মারাত্মক অস্ত্র, কয়েদীর কাছে ছুরী রাখা বিপজ্জনক। সুপার অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে একখানি পেনসিল-কাটা ছুরী দিলেন। তবে কথা রইলো যে ছুরীখানি গান্ধিজীর কাছে থাকবে না, থাকবে ওয়ার্ডারের কাছে, দরকার মত ছুরীখানি চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ওয়ার্ডার ছুরীখানি জেলারের কাছে জমা দেবে, আবার ওয়ার্ডার সকালবেলা চেয়ে আনবে অফিস থেকে।

এখানকার জেলের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছিল মুলসিপেটার কয়েদীদের নিয়ে।

তখন ফেব্রুয়ারী মাস। শীতের আমেজ প্রভাতী দীপ্তিকে কুয়াসাচ্ছন্ন করে রেখেছে। গান্ধিজী উপাসনা শেষ করে সবেমাত্র তাঁর পুঁথীপত্র পেতে বসেছেন এমন সময় একটা আর্ত চীৎকার কানে এসে বিঁধলো। গান্ধিজী চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কান পেতে শুনলেন—চাবুক মারা হচ্ছে!

চাবুক মারছে!

মহাত্মাজী তাকিয়ে রইলেন বাইরের পানে! তাঁর আঁধার-কুঠরীর সামনে দিয়েই কয়েদীদের যাতায়াতের পথ। কিছুক্ষণ পরেই সেই পথ দিয়ে ওয়ার্ডাররা ফিরলো, সঙ্গে চার-পাঁচজন কয়েদী। বয়স কম, পরণে চটের পোষাক, পিঠ খোলা। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ধীরে ধীরে তারা চলেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ ব্যাথাকাতর।

মহাত্মাজীকে তারা নমস্কার করলো।

গান্ধিজী প্রতি-নমস্কার জানালেন।

তাদের পিছনে দেখা দিল আরেকজন, তার পায়ে আবার বেড়ী লাগানো, পা টেনে টেনে সে চলছে। সে-ও মহাত্মাজীকে নমস্কার করলো।

মহাত্মাজী আর থাকতে পারলেন না, কয়েদীর সঙ্গে কথা বলা জেলের নিয়ম নয়, তবু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে?

—আমি মুসলিপেটার লোক।

—যাদের চাবুক মারা হোল তাদের আপনি জানেন?

—সকলকেই জানি। তারা সবাই মুলসিপেটার লোক।

পদে পদে কয়েদী ক'জন দেয়ালের আড়ালে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। গান্ধিজী কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারলেন না।

জেলের ভিতরকার কোন খবরই চাপা থাকে না। ওয়ার্ডার আসতেই তার মুখে গান্ধিজী সব কথা শুনলেন: মুলসিপেটার সব ক'জন স্বদেশী করে জেলে এসেছে। প্রত্যেকেই বেপরোয়া; কর্তাদের আদেশ মত সব সময় মাথা নত করতে পারে না। কথায় কথায় কর্তাদের সঙ্গে তাদের ঠোকাঠুকি বাধে। কর্তারা সব সময়েই তাদের উপর বিরূপ।

এবার তারা রীতিমত কাজ করতে চায় না এই অজুহাতে জেল-সুপার মেজর জোন্স তাদের বেত মারার হুকুম দিয়েছেন।

বিকাল বেলা খবর এলো, এই আদেশের প্রতিবাদে আঁধার-কুঠরীর সমস্ত কয়েদী হরতাল করেছে। তখন গান্ধিজী মেজর জোন্সের কাছে লিখলেন—ওদের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করার অনুমতি দিন, ওদের বুঝিয়ে ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করি।

সুপার জানালেন: আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু কয়েদীদের দেখা করতে দেওয়া জেল-আইনের বিরোধী।

মহাত্মাজী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ওয়ার্ডারের মুখে খবর পাঠালেন জয়রামদাসের কাছেঃ মুলসিপেটার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে সত্যিকারের সত্যাগ্রহীরা জেলে এসে দৈনিক কাজ করতে অস্বীকার করতে পারেন না।

মহাত্মাজীর অনুরোধ জয়রামদাসের কাছে আদেশ। তিনি মুলসিপেটার কয়েদীদের সঙ্গে দেখা করে গান্ধিজীর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন। কিন্তু জেলের আইন ভাঙ্গার জন্য জয়রামদাসকে সাজা পেতে হোল। মহাত্মাজী সুপারকে লিখলেন—আমিই জয়রামদাসকে জানিয়ে ছিলাম, শাস্তি আমারই প্রাপ্য !

সুপার উত্তর দিলেন—আপনি আইন অমান্য করেননি। সে জন্য আপনাকে সাজা দিতে পারি না। যিনি বে-আইনী কাজ করেছেন তাঁকেই শাস্তি দিয়েছি।

কিন্তু এর পরেই মহাত্মাজীকে জেলের এক প্রান্তে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে বদলী করা হোল। এখানকার ঘরগুলি বেশ বড় বড়, বেশী আলো হাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ঘরের সামনে একটুকরো বাগানও আছে। তবে এখানে আর কোন কয়েদীর মুখ দেখার উপায় নেই। ওয়ার্ডার আর ফালতু (চাকর) ছাড়া একেবারেই নিঃসঙ্গ।

তবে জেলে কোন খবরই চাপা থাকে না। ওয়ার্ডার এসে একদিন বললো—আজ আবার মুলসিপেটার একজন কয়েদীকে বেত মারা হয়েছে।

ক'দিন পরে আবার ছ'জনকে বেত মারা হোল। এবার মুলসিপেটার সব কয়েদী একযোগে উপবাস সুরু করলো।

গান্ধিজী আবার সুপারকে লিখলেন—আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমি ওদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আমার বিশ্বাস বুঝিয়ে বললে ওরা বুঝতে পারবে এবং ওদের চাবুক মারার আর দরকার হবে না। আমি কয়েদী হিসাবে এই অনুমতি চাইছি না, মানুষ হিসাবে মানুষকে সেবা করার জন্য এই অনুমতি চাইছি। আশা করি কর্তৃপক্ষ এতে আপত্তি করবেন না।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ আপত্তি জানালো।

তবু সহজে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ মহাত্মাজী নন! ক'দিন ধরে শুধুই লেখালেখি চললো। শেষে গান্ধিজী জানালেন—অনুমতি না পেলে আমি এমন কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব, যার ফলে কর্তৃপক্ষ নানা ঝঞ্ঝাটে পড়বেন, তবে তেমন কিছু না করাই আমার ইচ্ছা।

এদিকে কয়েদীরাও অন্নজল গ্রহণ করে না, বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দিতে হোল। জেলের কর্তারা গান্ধিজীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কয়েদীদের কাছে। গান্ধিজী দু'পক্ষের মাঝে একটা বোঝাপড়া করে দিলেন, কয়েদীরা অনশন ত্যাগ করলো। জেলের কর্তারাও বেত-মারা-আইন বদলে ফেললেন—কোন জেল কর্মচারীকে আক্রমণ করলেই বেতমারা হবে, অন্য কোন কারণে নয়।

নিশ্চিন্ত মনে গান্ধিজী আবার তাঁর দৈনন্দিন কর্মতালিকা সুরু করলেন।

য়েরোড়া জেলে গান্ধিজী ছিলেন ৮৬৭৭ নং কয়েদী। একজন কয়েদী ওয়ার্ডার ও একজন ফালতু সারাদিন তাঁর কাছে থাকতো। গান্ধিজীর উপর নজর রাখা আর সেবা করা এই দুই ছিল তাদের কাজ।

দু' তিন মাস পর পর ওয়ার্ডার ও ফালতু বদল হোত। যে যেমন লোকই আসুক মহাত্মাজী তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতেন। মহাত্মাজী কাউকে শেখান চলনসই লেখাপড়া, কেউ শেখে ভাল করে সূতা কাটতে, আবার কেউ-বা প্রার্থনার সময় গান্ধিজীর সামনে বসে রাম-নাম শুনতো।

সন্ধ্যাবেলা ওয়ার্ডার ও ফালতুর সঙ্গে বসে গান্ধিজী গল্প করতেন। কয়েদী-জীবনের নানা সুখদুঃখের কাহিনী ওরা বলে যেত। এক একজন দশ-বারো বছর করে জেল খাটছে, জেলের ভিতরকার অনেক তথ্যই তাদের নখদর্পণে। এই সম্পর্কে গান্ধিজী লিখেছেন: "যদি জেলের সমস্ত মাটি দু'ফুট খুঁড়ে ফেলা হয়, তাহলে, কয়েদীদের অনেক গুপ্ত কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়বে—অনেক চামচ, ছুরী, বাসন, সাবান, সিগারেট বেরিয়ে পড়বে...."

গান্ধিজীর মত মানুষ সরলভাবে চাইলে 'মডার্ণ রিভিউ'য়ের মত একখানি মাসিক পত্রিকা পাবেন না, কিন্তু দুষ্ট কয়েদী গোপনে সিগারেট অবধি সংগ্রহ করতে পারে।

গোড়ার দিকে হরকরণ নামে এক পাঞ্জাবী হিন্দু গান্ধিজীর খবরদারী করতো। লোকটি পাঞ্জাবী হিন্দু। খুনের দায়ে চৌদ্দ বছর জেল হয়েছিল। জেল খাটতে খাটতে লোকটির মেজাজ হয়ে পড়েছিল খিট্‌খিটে। গান্ধিজীর কাছে মাঝে মাঝে সে নিজের জীবনের টুকরো টুকরো কাহিনী বলতো—কেমন করে সে জেলের কর্তাদের চোখে ধূলো দিত, কেমন করে সে ভালো খাবার জোগাড় করতো, ইত্যাদি....

কিন্তু যেদিন সে প্রথম বুঝলো, গান্ধিজী সাধারণ কয়েদী নন, মহাত্মার মাহাত্ম্য যেদিন তার চোখে ধরা পড়লো, সেদিন থেকে গান্ধিজীর সেবায় সে একান্ত ভাবে নিজেকে নিযুক্ত করলো। সে গান্ধিজীকে ঘর ঝাঁট দিতে দিত না, কম্বলখানি তুলে শুখাতে দিতে গেলে সে গান্ধিজীর হাত থেকে তা কেড়ে নিত। গান্ধিজী কাপড় কি গামছা কাচছেন শুনতে পেলে হরকরণ কলঘরে ঢুকে গান্ধিজীর হাত থেকে তা কেড়ে নিত।

জেল কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাপারটা গোপন রইলো না, তারা হরকরণকে বদলী করে দিল।

গ্রীষ্মের দিনে গান্ধিজী ঘরের বাইরে শয়ন করতেন, সেই সময় তাঁকে পাহারা দিতো এক বেলুচী মুসলমান—সাবাস খাঁ! লম্বা চওড়া বিরাট দেহ, খুনের দায়ে সে জেল খাটছে। প্রথম পরিচয়েই সাবাস বললো—আপনি আমাকে বন্ধুর মত দেখবেন, আপনি যা খুসী করবেন, আমি কোন বাধা দোব না যা দরকার হয় বলবেন আমি সানন্দে করে দোব!

সাবাসের ব্যবহার ছিল ভদ্র, মাঝে মাঝে সে গান্ধিজীকে ধরে বসতো ভালো সুস্বাদু খাবার জন্য, কিন্তু গান্ধিজী খেতেন না দেখে সে দুঃখিত হোত।

সাবাস খাঁয়ের পরে এলো আদন। আদন সোমালি সৈনিক, যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়ায় দশ বছর জেল হয়েছিল।

হরকরণের বদলে এলো ভিত্তয়া। সে অস্পৃশ্য—মারাঠী মাহার। সে অনেক ইতস্ততঃ করে গান্ধিজীর কুটীরের মধ্যে ঢুকতো। কোন বাসন ছুঁতো না। শেষে তার সঙ্কোচকে দূর করার জন্য গান্ধিজী একদিন বললেন যে অস্পৃশ্যতা তিনি মানেন না। অল্প দিনের মধ্যেই ভিত্তয়া সুতা কাটা, তাঁত বোনা শিখে ফেললো। কিছুদিন পরে সে মুক্তি পায়। বিদায়ের দিন সে প্রতিজ্ঞা করে যে বাইরে গিয়ে খদ্দর ছাড়া সে আর কিছুই পরবে না।

ভিত্তয়ার পরে এলো থামু। সে-ও মারাঠী। চরকা কাটা শিখে নিয়ে সাত দিনের মধ্যে সে গান্ধিজীর চেয়ে মিহি সুতা কাটতে সুরু করলো। রোজ সকালে সে গান্ধিজীর সঙ্গে সুতা কাটতে বসতো। দিনে চার ঘণ্টা সে সুতা কাটতো।

থামুর পরে এলো কুণ্ডী নামে এক গুর্খা আর গঙ্গাপ্পা নামে এক ক্যানাড়ী।

গঙ্গাপ্পা বয়স্ক লোক, কিন্তু মানুষ ছিল ভালো। গান্ধিজীর জিনিষপত্র যেন নিখুঁৎভাবে সাফ থাকে তা সে দেখতো, গান্ধিজীর অসুখের সময় সে খুব ভালো করেই তাঁর সেবা করতো। গান্ধিজী প্রার্থনা করতে বসলে গঙ্গাপ্পাও তাতে যোগ দিত।

গান্ধিজী যেখানে থাকতেন, সেই ঘরের একপাশে একটা কাঁটা-তারের বেড়া দেওয়া ছিল, তার পাশেই খানিকটা খোলা জায়গা। কিন্তু সেখানে একটা খড়ির দাগ টানা ছিল, সেই দাগ পার হবার অধিকার গান্ধিজীর ছিল না। পরে গান্ধিজী ওই গণ্ডীটা পার হবার অনুমতি পেয়েছিলেন।

গান্ধিজী ছিলেন বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী। প্রতি তিন মাসে একখানি করে চিঠি তিনি জেলের বাইরে পাঠাতে পারতেন আর একবার দেখা করতে পারতেন বাইরের লোকদের সঙ্গে। কিন্তু জেলের কর্তারা সব সময় এই নীতি মানতো না। অনেক সময় গান্ধিজীর চিঠি বাইরে পাঠাতে তারা অস্বীকার করতো।

দেখা করার ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ খামখেয়ালীর পরিচয় দিত। একবার কস্তুরবা'কে জেলের দরজা থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পণ্ডিত মতিলাল ও হাকিম আজমল খাঁ দেখা করার অনুমতি পাননি।

তবে বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী বলে আহারাদির কিছু সুবিধা গান্ধিজী পেয়ে ছিলেন। দু' সের ছাগলের দুধ, কমলা লেবু, কিস্‌মিস্‌ প্রভৃতি তাঁকে দেওয়া হোত।

কিন্তু অন্যান্য যেসব সহকর্মীরা জেলে আছেন, তাঁরা যখন আহারাদির কোন সুবিধা পান না, শুধু গান্ধিজীকে এই সুবিধা দেওয়া হয়, জেনে শুনে মহাত্মাজী তো দু'মুখো নীতি মানতে পারেন না। তিনি আপত্তি জানিয়ে কমলালেবু ও কিস্‌মিস্‌ খাওয়া ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ওই সব খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। বর্জন করার ফলে উত্তরোত্তর তাঁর শরীর কাহিল হয়ে পড়লো। দু' মাসের মধ্যে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন—অন্ত্রের পীড়া। সামান্য কিছু আহার করলেই পেটে ব্যথা হয়, কোন রকমেই এতটুকু সুস্থির হতে পারেন না ; দেখে শুনে ডাক্তাররা বললেন—এপেন্‌ডিসাইটিস্‌।

একদিন ব্যথা এতই অসহ্য হয়ে উঠলো যে সেই রাত্রেই পুণার সেসুন হাসপাতালে মহাত্মাজীকে স্থানান্তরিত করতে হোল।

কর্ণেল ম্যাডক বললেন—এখনই অপারেশন করতে হবে।

সবে অপারেশন আরম্ভ হয়েছে এমন সময় হাসপাতালের ইলেকট্রিক গেল বিগড়ে—অপারেশন-থিয়েটার অন্ধকার হয়ে গেল।

কখন আলো জ্বলবে ঠিক নেই, চুয়ান্ন বছরের এক বৃদ্ধকে অপারেশন টেবিলের উপর বেশীক্ষণ ফেলে রাখাও যায় না। একেই তিনি দুর্বল তার উপর বেশী রক্তপাত হলে হয়তো আর জ্ঞান ফিরে আসবে না।

ডাক্তাররা তখনই হারিকেনের ব্যবস্থা করলেন, সেই স্তিমিত আলোকে কর্ণেল ম্যাডক অপারেশন শেষ করলেন।

ইলেকট্রিক আবার যখন জ্বললো তার অনেক আগেই কাজ শেষ হয়ে গেছে, ততক্ষণ ফেলে রাখলে সে যাত্রা মহাত্মাজী রক্ষা পেতেন না।

দুর্বল গান্ধিজী আরো দুর্বল হয়ে পড়লেন। ক'দিন পরে সরকার গান্ধিজীকে ছেড়ে দিল, ছ' বছর কারাদণ্ডের তখনও দু' বছর পূর্ণ হয়নি।

এই দু' বছরে গান্ধিজী ৮৫ খানি ইংরাজী বই, ৩১ খানি গুজরাটী বই, ৬ খানি হিন্দী বই, ৫ খানি উর্দু বই এবং ২৬ খানি মারাঠী বই পড়েন। ধর্মের বই পড়তেই তিনি বেশী ভালবাসতেন। হিন্দী ও গুজরাটী ভাষায় রামায়ণ পড়লেন তিনখানি: বাল্মীকি রামায়ণ, তুলসীদাসী রামায়ণ ও গিরিধর কৃত রামায়ণ। গীতা পড়লেন তিনখানি: লোকমান্যের গীতারহস্য, শখুরামের গীতা ও শ্রীঅরবিন্দের গীতা। ২৪ খানি উপনিষদের মারাঠী ভাষ্য পড়লেন। তারপর পড়লেন ম্যাক্স্‌মূলারের উপনিষদ ও শ্রীঅরবিন্দের উপনিষদ। তাছাড়া মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, বিবেকানন্দের রাজযোগ, বাইবেল প্রভৃতিও পড়লেন।

গভীর ধর্মপুস্তকগুলির মধ্যে মহাত্মাজী যখন অন্তরের উপলব্ধিকে স্বচ্ছ করে তুলছিলেন, তখন আবার ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী অনেক হাল্‌কা বইও তিনি পড়েছিলেন: লুসিয়ানের লেখা 'ট্রিপ-টু-দি-মুন', 'টম্‌ ব্রাউনস্‌ স্কুল ডেজ',

'ডাক্তার জেকিল এণ্ড মিষ্টার হাইড', কিপলিংয়ের 'জাংগ্‌ল্ বুক', জুলভার্ণের 'ড্রপ ফ্রম দি ক্লাউডস্' একদিকে পড়েছেন, আরেকদিকে পড়েছেন এইচ-জি-ওয়েল্‌সের 'আউট-লাইন্‌স্-অফ-হিষ্ট্রী', রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য', 'মুক্তধারা', 'নৌকাডুবি'; আবার 'মিশরকুমারী'র গুজরাটী অনুবাদ।

ইতিহাস, প্রবন্ধ ও ভূগোল সম্পর্কে ভালো বই তিনি যা হাতের কাছে পেয়েছেন পড়েছেন।

হিন্দি মাসিক পত্রিকা 'সরস্বতী' তাঁর কাছে নিয়মিত ভাবে পোঁছাতো।

বোম্বের 'টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া', কলিকাতার 'মডার্ণ রিভিয়ু', গুজরাটী 'বসন্ত' ও 'সমালোচক' প্রভৃতি পত্রিকা পাবার জন্য তিনি আবেদন করেন, কিন্তু সে আবেদন গ্রাহ্য করা হয়নি।

মহাত্মাজী বলেন—কয়েদীদের কতকগুলি অধিকার আছে—হাওয়া, জল, খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার। মনের খোরাক পাবার অধিকারও আমাদের আছে! সেই দিক থেকে এই পত্রিকা পাওয়াটা আমি উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া বলে মনে করি।

জেলের কর্তারা উত্তর দিলেন—আমরা কিছুই করতে পারি না, উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

গান্ধিজী আর কিছু বলেননি।

মহাত্মাজী শুধুই পড়তেন না, কিছু কিছু লিখতেনও। ক' মাসের মধ্যে ছোটদের জন্য গুজরাটী ভাষায় তিনি একখানি পাঠ্য পুস্তক শেষ করলেন। বইখানি ছাপাবার জন্য পাঠালেন কিন্তু বইখানি জেলের ফটক পার হতে পারলো না। ইনস্‌পেক্‌টার-জেনারেল কর্ণেল ডালজিয়েন বইখানি গান্ধিজীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, জানালেন—কয়েদীরা যখন জেল খাটে সেই সময় তাদের কোন পুস্তক প্রকাশ করতে দেওয়া হয় না।

১৯৩২শের ২০শে সেপ্টেম্বর।

আবার সেই য়েরোড়া জেলখানা—

রাত তিনটের সময় গান্ধিজী একখানি টেলিগ্রামের ফর্মের উপর একটির পর একটি শব্দ বসাচ্ছেন, টেলিগ্রামখানি যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। গান্ধিজী লিখেছেন ঃ

—'গুরুদেব, এখন প্রত্যূষে তিনটে, মঙ্গলবার। আজ দুপুর থেকে আমার অগ্নিপরীক্ষা সুরু হবে। আপনার আশীষ চাই। আপনি আমার সত্যকারের সুহৃদ, কারণ আপনি আমার আন্তরিক শুভকামী। আপনার অন্তর যদি আমার কাজ সমর্থন করে, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন। তা-ই হবে আমার অবলম্বন। আশা করি আপনি আমাকে বুঝতে পেরেছেন। প্রীতি জানবেন— মঃ কঃ গান্ধী।'

ভোরবেলা টেলিগ্রামখানি পাঠাবার অল্পক্ষণের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের 'তার' পৌঁছালো, গান্ধিজীর তারের উত্তর নয়, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ ঃ

—'মহাত্মাজী, ভারতের ঐক্য ও সামাজিক সংহতি রক্ষার জন্য মূল্যবান জীবন আহুতি দেবার প্রয়োজন আছে....আমার দুঃখিত অন্তর শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে আপনার মহান প্রায়শ্চিত্তের গতি লক্ষ্য করছে—রবীন্দ্রনাথ।'

গান্ধিজীর মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠলো। বেলা দ্বিপ্রহর থেকে তিনি অনশন সুরু করলেন। এ অনশন জাতির প্রায়শ্চিত্ত,—অস্পৃশ্যতার মুক্তি। গান্ধিজী বললেন—ভারতের সাত কোটি হিন্দু অস্পৃশ্য, বহু শতাব্দী ধরে তাদের একপাশে ফেলে রেখে যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি অনশন করলাম। এর প্রতিবিধান না করতে পারলে আমি দেহ রক্ষা করবো, সামান্য নুণ-জল কিংবা সোডার জল ছাড়া আমি আর কিছুই খাব না!

ওয়ার্ডের সামনে দেড়শো ফীট লম্বা ও চল্লিশ ফীট চওড়া একটি বারান্দা, সেই বারান্দার একপাশে ছোট একটি আমগাছের নীচে গান্ধিজীর খাটিয়া পাতা হোল। খাটিয়ার উপর একখানি লাল কম্বল পাতা, সেই বিছানার চারিপাশে এসে সমবেত

হলেন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গের দল—কস্তুরবা, সরোজিনী নাইডু, বাসন্তী দেবী, সর্দার প্যাটেল প্রভৃতি। ধীরে ধীরে সমবেত কণ্ঠে একটি গুজরাটি ভজনের সুর উঠলো :

উঠ, জাগো মুসাফির, ভোর ভই
অব রৈন কহাঁ জো সোবত হৈ ?
জো সোবত হৈ বহ খোবত হৈ
জো জাগত হৈ বহ পাবত হৈ ! ইত্যাদি....

[পথিক জাগো, প্রভাত হয়েছে। আর রাত্রি নাই তবু শুয়ে আছ কেন ? যে শুয়ে থাকবে তার সব যাবে, যে জাগবে সেই পাবে শান্তি।]

গান্ধিজীর অনশন ! জেলের নিয়মকানুন সব গেল বদলে। ভিতরে প্রবেশের কড়াকড়ি আর রইল না। কতজন আসছে, গান্ধিজীর খবর নিচ্ছে। দু'জন ডাক্তার বসে আছেন পাশে, জেলের কর্তারা ব্যস্ত, বিব্রত।

গান্ধিজীর অনশন ! সারা ভারত চঞ্চল। মন্দিরে মসজিদে প্রার্থনা হচ্ছে —হে ভগবান, হে খোদা, গান্ধিজীকে তুমি রক্ষা কর।

দিনে দু'বার প্রকাশিত হচ্ছে স্বাস্থ্যের বুলেটিন।

জেল আর গোপন কারাগার নাই, জেল হোল তীর্থক্ষেত্র, সমগ্র ভারতের আকর্ষণকেন্দ্র।

ভারতের সমস্ত নেতারা এলেন জেলখানায়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, তেজ বাহাদুর সাপরু, মুকুন্দ রাম রাও জয়াকর, ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ঘনশ্যামদাস বিরলা, শংকর লাল ব্যাংকার, রাজভোজ, হংস মেহেতা, পুরুষোত্তমদাস, বালচাঁদ হীরাচাঁদ, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, কোদণ্ড রাও, গ্যাডগিল, মন্নু সুবেদার, অবন্তিকা বাঈ গোখেল এবং আরো অনেকে আলোচনা করতে বসেন,—গান্ধিজীর অনশন নিবারন করতে হবে। ইংরেজেরা উচ্চবর্ণের হিন্দু ও অস্পৃশ্য হিন্দুদের মধ্যে ভারতবাসীকে দু'ভাগে ভাগ করে দিচ্ছেন, তা রুখতে হবে! যতদিন যায়, গান্ধিজীর স্বাস্থ্য যতো খারাপ হতে থাকে, আলোচনা এগিয়ে চলে ততো দ্রুত।

ডাক্তারেরা শঙ্কিত হয়ে উঠেন।

রবীন্দ্রনাথ ছুটে গেলেন পুনায়। গান্ধিজীর অবস্থা দেখে কবিগুরুর চোখে জল এলো।

নেতারা তার করলেন বিলাতে।

অবস্থার গুরুত্ব দেখে বৃটিশ শাসকদের নতি স্বীকার না করে উপায় রইল না, তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হোল। বিকালবেলা উত্তর এলো—আপনারা যা সিদ্ধান্ত করেছেন তাই আমরা মেনে নিলাম।

গান্ধিজী অনশন ভাঙলেন। সারা ভারতে উল্লাসের বন্যা বহে গেল, ঝুড়ি-ঝুড়ি ফল আর সন্দেশ আসতে লাগলো জেলখানায়।

মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, জার্মাণী, আমেরিকা, জেনেভা, ইংলণ্ড—সর্বত্র থেকে আসতে লাগলো অভিনন্দন।

দুর্যোগ কেটে গেল। জেলখানায় যে সর্বসাধারণের প্রবেশ অধিকার ছিল, কতৃপক্ষ তা আবার সংক্ষেপ করে দিলেন! আবার সেই চারিপাশের উঁচু পাঁচীল, মেট আর ফালতু····

কিন্তু গান্ধিজীকে রুদ্ধ করে রাখার শক্তি বৃটিশের কোথায়? গান্ধিজী বললেন—আমি হরিজনদের সেবা করবো।

কর্তারা বললেন—তা হয় না।

গান্ধিজী বললেন—আমি জেলে থেকেই তা করবো।

কর্তারা বললেন—তা'ও হয় না।

গান্ধিজী বললেন—বেশ, হরিজন উন্নয়নের কাজকে দ্রুততর করার জন্য আমি আবার অনশন সুরু করবো!

কর্তারা এবার বিপদে পড়লেন। জেলের মধ্যে মহাত্মাজীর অনশন করা তো মহা হাংগামার ব্যাপার, তার উপর এই তো ক'দিন আগে উপবাস করেছেন এখনও রীতিমত সুস্থ হন নি, এর পর আবার উপবাস। গান্ধিজীর মৃত্যু ঘটলে সে দায়িত্ব নেবে কে?

গান্ধিজী এক কথার মানুষ, তিনি আবার অনশন সুরু করলেন।

গবর্ণেন্ট তাড়াতাড়ি গান্ধিজীকে ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

[মুক্তির পরেও গান্ধিজীর উপবাস চললো পূরো একুশ দিন।]

তারপর ১৯৪২য়ের আগষ্ট থেকে ১৯৪৪য়ের মে অবধি—

এবার আর কোন জেলখানা নয়, এবার বোম্বায়ের বিরাট আগা-খাঁ প্রাসাদে। এক অংশে গান্ধিজী বন্দী আর বাকী অংশে সৈন্যদের ব্যারাক।

এবারকার ইতিহাস বৃটিশ শাসনের কলঙ্কিত কাহিনী, গান্ধিজীর জীবনের এক অশ্রুসজল পরিচ্ছেদ।

গান্ধিজীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বিশ বছরের সহকর্মী মহাদেব দেশাই। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, সপ্তমদিনে সকাল বেলা প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর সহসা মহাদেব শুয়ে পড়লেন, বললেন—আমার শরীরটা কেমন করছে!

গান্ধিজী তখনই খবর পাঠালেন, জেলের ডাক্তররা ছুটে এলো। সুশীলা নায়ার সেখানে ছিলেন, তিনি এসে মহাদেবের ধমনীর গতি পরীক্ষা করলেন, কিন্তু মহাদেবের তখন আর কোন চেতনা নেই।

কতজন কত চেষ্টা করলেন, কিন্তু মহাদেবের চেতনা আর হোল না। ধমনীর স্তিমিত গতি ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে গেল।

গান্ধিজীর অনুগামী গুরুর পদপ্রান্তে আত্মাহুতি দিয়ে গেলেন।

ডাক্তাররা বিদায় নিল।

প্রশান্ত দেহটি পুষ্পাচ্ছাদিত করে গান্ধিজী ও সুশীলা নায়ার গীতা পাঠ করতে বসলেন। গীতার শ্লোকগুলি হয়তো তাঁর চোখের জলে ম্লান হয়ে যাচ্ছিল, বাণীগুলি স্পষ্ট তাঁর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবার আগে শোকের আবেগে হয়তো কণ্ঠপ্রান্তে এসে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু জীবনকে জয় করতে যাঁর সাধনা, চল্লিশ কোটী নরনারীর ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস যিনি মাথা পেতে নিয়েছেন,

ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির পানে তাকালে তাঁর তো চলবে না, শোককে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে, জীবনের দীর্ঘপথ শান্ত পদক্ষেপে অতিক্রম করতে হবে যে !

মহাদেবের শেষ-কাজ গান্ধিজীই করেন ; মহাদেবের স্ত্রী ও পুত্রকন্যার কাছে খবর পাঠান, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা কয়েকদিন চেপে রাখেন।

মহাত্মাজী চিতাভস্ম তুলে রাখেন সযত্নে।

দেশনায়কের ব্যক্তিগত সুখসুবিধা থাকে না, পরাধীন দেশের শাসকেরা অধীন দেশের নেতাদের কোন সুবিধাই দেয় না। বৃটিশ শাসকেরাও ১৯৪২ সালের যত কিছু দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন কংগ্রেসের উপর। গান্ধিজী ছিলেন কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা। শোকের অবসর তিনি পেলেন না, তিনি প্রতিবাদ তুললেন।

কিন্তু মিথ্যাই যাদের রাজনীতি, তাদের কাছে প্রতিবাদের মূল্য কতটুকু। কাজেই নিরুপায় গান্ধিজীকে আবার সুরু করতে হোল অনশন।

কাছে ছিলেন কস্তূরবা', সরোজিনী নাইডু ও মীরা বেন। ডাক্তার গিলডার ছিলেন য়েরোড়া জেলে, তাঁকে আনা হোল পুণার বন্দীবাসে।

তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধের একুশ দিন উপবাস। সামান্য একটু করে নেবুর জল ছাড়া আর সব কিছুই অগ্রাহ্য।

শীর্ণ দেহ শীর্ণতর হতে থাকে। বমির ভাব দেখা দেয়। রাত্রে ঘুম হয় না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন, কথা বলেন ধীরে ধীরে। বৃটিশ মিথ্যাচারের সঙ্গে সুরু হয় নীতির শাসন।

দিনের পর দিন যায়, কথা বলতে গান্ধিজীর কষ্ট হয়। এক ঢোক জল খেতে হলে বুকে বাজে। চারিদিক থেকে ডাক্তাররা ছুটে আসেন।—কলিকাতা থেকে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুশীলা নায়ার, বোম্বাই থেকে সার্জেন-

জেনারেল মেজর-জেনারেল ক্যাণ্ডি, লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল ভাণ্ডারী, লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল শা।

দ্বাদশ দিনে গান্ধিজী চেতনা হারালেন। বেলা চারটের সময় ধমনীর গতি আর অনুভব করা গেল না। ইউরিমিয়ার লক্ষণ দেখা দিল। ডাক্তাররা চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

সাতটি দিন এইভাবেই চললো। সারা ভারত থম্ থম্ করতে লাগলো, ভারত সরকারের তিনজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন, পণ্ডিত মালব্য চার্চিল সাহেবকে 'তার' করলেন গান্ধিজীর মুক্তির অনুরোধ জানিয়ে।

গান্ধিজী তখন আর মানুষ চিনতে পারছেন না। মুখ থেকে লালা ঝরছে, আর বোধ হয় বেশীক্ষণ নয়!

দু'একটা ইঞ্জেকশন দিলে হয়তো অবস্থা ফেরে, কিন্তু গান্ধিজী ডাক্তারদের অনুরোধ করেছিলেন—আমি চেতনা হারালে আমাকে যেন এলোপ্যাথিক চিকিৎসা না করানো হয়, আমি যদি মরি যেন শান্তিতেই মরি!

বিংশ শতকের যীশুর গায় তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সূচ বেঁধাবে কে? কিন্তু চল্লিশ কোটি মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতিভূকে এতো সহজে ছেড়ে দিতে ডাক্তারদেরও মন চায় না। গান্ধিজীর অবস্থা দেখে তাঁদেরও বুঝি ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে।

দাম্ভিক চার্চিল বিলাতে বসে সব খবরই রাখেন। সাম্রাজ্যবিলাসীদের এতো বড় শত্রুটি এতোদিনে এমন নির্বিবাদে জগৎ থেকে সরে যাচ্ছেন দেখে তিনি বোধ হয় মনে মনে খানিকটা খুসিই হন। ভারত সরকার সেই খুসির প্রতিধ্বনি তোলে গান্ধিজীর সৎকারের সম্ভাবনায় প্রচুর চন্দন কাঠ সংগ্রহ করে।

কিন্তু চল্লিশ কোটি মানুষের একান্ত কামনা ভগবানের চরণে গিয়ে পৌঁছালো, গান্ধিজীর অবস্থার উন্নতি হতে সুরু হোল। বিধানচন্দ্র রায়ের মত ডাক্তার বললেন—মৃত্যুর দ্বার থেকে গান্ধিজী ফিরে এলেন, কি করে যে তা সম্ভব হোল, তা আমরা বলতে পারি না।

বিজ্ঞানের উপরেও যে একজন আছেন, সে কথাটা গান্ধিজী এবার প্রমাণ করলেন।

একুশ দিন পরে গান্ধিজী যখন অনশন শেষ করলেন তখন তাঁর দেহের ওজন চৌদ্দ সের কমে গেছে!

বন্দীবাসের নিয়মকানুন আবার কঠোর করা হোল, তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধকে বাইরের মুক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্য-উদ্ধারের সুযোগ দিলেন না চার্চিল সাহেব।

চল্লিশ কোটি মানুষের পরাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করতে যিনি অগ্রগামী হয়েছেন তাঁর দুঃখভোগ তো এতো সহজে শেষ হতে পারে না!

বন্দীবাসে কস্তুরবা' অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর শ্বাসনলী ফুলে উঠলো। আর তারই সঙ্গে দেখা দিল ব্রংকাইটিস্ ও বুকের যন্ত্রণা। চোখের পাতাগুলি ফুলে উঠলো, হৃদ্‌স্পন্দন উঠলো ১৮০ বার। ডাক্তার গিলডার ও ডাক্তার নায়ার জেলের কর্তাদের কাছে লিখলেন কস্তুরবা'র কাছে একজন সেবিকা রাখার জন্য।

কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করলেন না। পৌত্র কানু গান্ধীকে এক দিন অন্তর দেখা করার অনুমতি দিলেন মাত্র। পুত্র হীরালাল দেখা করতে এসে ঢুকতে পেলেন না। এদিকে রোগিণীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগলো, ধমনীর গতি হয়ে এলো দুর্বল, শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগলো। ডাক্তার নায়ার ও ডাক্তার গিলডার সেইখানেই বন্দী ছিলেন, তাঁরা জানালেন—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় আর ডাক্তার জীবরাজ মেহেতাকে একবার দেখানো দরকার। কিন্তু গবর্মেণ্ট সেদিক থেকে কোন সাড়া দিলেন না।

গান্ধিজী তখন অসুস্থ—শয্যাশায়ী। তাঁর রক্তের চাপ ১০৬।১১০। সেই অবস্থাতেই তিনি কর্তাদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখতে সুরু করলেন। অনেক করে কানু গান্ধী কাছে থাকার অনুমতি পেলেন আর চিকিৎসার অনুমতি পেলেন

বৈদ্যরাজ শিবশর্মা—কিন্তু সর্ত রইলো বন্দীবাসে তিনি রাত কাটাতে পারবেন না। দরকার হলে তাঁকে ডাকা হবে। ডাক্তার জীবরাজ মেহেতাও এলেন। রোগিণীর অবস্থা দেখে সারারাত তাঁরা ফটকের বাইরে মোটারে বসে থাকতেন। অসুখ বাড়লে রাত্রে সেইখান থেকে তাঁদের ডেকে আনা হোত।

কবিরাজী চিকিৎসায় কোন ফল হোল না। রোগিণীর স্বর বন্ধ হয়ে গেল।

অসুস্থ গান্ধিজী সারাক্ষণ রোগিণীর পাশে বসে থাকেন। রোগিণী ছটফট করেন, গান্ধিজী ধীরে ধীরে কপালে হাত বুলিয়ে দেন। চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ স্বামীর কোলে মাথা রেখে কস্তূরবা' শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শিব চতুর্দশীর সন্ধ্যা রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে সূর্যের শেষ রশ্মিরেখা জগতের বুক থেকে মুছে দেয়। গান্ধিজী চুপ করে বসে থাকেন। সাম্রাজ্যবাদীর কারাগারে তাঁর জীবনসঙ্গিনী শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, উপযুক্ত সেবা ও যোগ্য চিকিৎসা করে শেষ মূহূর্ত তাঁর যাতনার এতটুকু লাঘব করতে পারলেন না, সারা জীবন অহিংসা ও মানবতার অনুশীলন করেও সাম্রাজ্যবাদীর লোভ ও নিষ্ঠুরতা তিনি জয় করতে পারলেন না। যাঁরা একাগ্রচিত্তে তাঁর সেবা করলেন, নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ করলেন তাঁর হাতে, তাঁর চোখের সামনেই তিল তিল করে তাঁরা মৃত্যু বরণ করলেন, তিনি তাঁদের রোগযন্ত্রণা উপশম করার জন্য সামান্য কিছুই করতে পারলেন না। নিজের এই অক্ষমতাই গান্ধিজীর চিত্তকে দোলা দিচ্ছিল কি না কে জানে! তাঁর চোখে জল এসেছিল কি? কালো আকাশের পানে তাকিয়ে, বাইরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে গান্ধিজী বোধ হয় ভাবছিলেন—কস্তূরবা' গেল, মহাদেব গেল, মতিলাল গেল, লজপৎ গেল, যতীন্দ্রমোহন গেল, দেশবন্ধু গেল, তিলক গেল, গোখ্‌লে গেল....আরো কত গেল—

"এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা—
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবেনা

এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?"

কিন্তু শোক করার মত অবসর তখন কোথায় ? শেষকৃত্যের জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করলেন—আমার পুত্র ও আত্মীয়দের হাতে মৃতদেহ সমর্পণ করা হোক ! কিন্তু সে অনুরোধ গবর্মেণ্ট রাখলেন না।

মহাদেব দেশাইয়ের দেহ যেখানে ভস্মীভূত করা হয়েছিল, তারই পাশে আগা-খাঁ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে কস্তূরবা'র শেষ-কাজ সমাধা করা হোল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে ধরণীর সঙ্গে দেহের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল, গান্ধিজী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। ভস্মাবশেষের পানে তাকিয়ে ধীরে ধীরে শ্রান্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—আত্মা হয়তো অনুভূতি উপলব্ধি করতে পারে !

বন্দীশালায় কস্তূরবা'র মৃত্যুতে ভারত সরকার বিশ্বের চোখে হেয় হয়ে গেলেন। বৃটিশ রাজনীতির ভিত্তিই ছিল মিথ্যাচার। দোষস্খালনের জন্য বিশ্বের কাছে তারা বললো, অসুস্থ কস্তূরবা'কে মুক্তি দেবার জন্য কেহ কোন অনুরোধ করেনি, এবং গান্ধিজীর অনুরোধেই আগা-খাঁ প্রাসাদের প্রাঙ্গণে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সত্যাগ্রহী এ ব্যাপার সইতে পারলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করলেন—মিথ্যা কথা !

গবর্মেণ্ট তার উত্তরে বললেন—ন্যায়োচিত স্বীকৃতি এই শোকের সময় আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়।

অসুস্থ শরীর, শোকার্ত মন, তার উপর সরকারী অপ-প্রচার, সব মিলে গান্ধিজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়লো। দেখা দিল ঘুষঘুষে জ্বর আর

আমাশয়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বোম্বাই গিয়েছিলেন, গবর্মেণ্ট তাঁকে অনুরোধ করলেন মহাত্মাজীকে একবার দেখে যাবার জন্য। অনেক দিন পরে ডাক্তার বিধানকে দেখে গান্ধিজী খুশী হলেন, কিন্তু চিকিৎসা করার কথা শুনে বললেন—ডাক্তার বিধান, তোমার চিকিৎসা তো আমি নিতে পারবো না।

বিধানচন্দ্র বিস্মিত হলেন, বললেন—আমার অপরাধ কি জানতে পারি?

গান্ধিজী বললেন—আমার দেশের চল্লিশ কোটি দীন-দুঃখীর অসুখে তুমি যখন চিকিৎসা করতে পার না, তখন আমিই-বা তোমার চিকিৎসা নোব কেন?

বিধানচন্দ্র বললেন—এই কথা! মহাত্মাজী, আমি চল্লিশ কোটি নরনারীর চিকিৎসা করতে পারিনি এ কথা সত্যি, কিন্তু এই চল্লিশ কোটি নরনারীর যিনি আশা ভরসা, চল্লিশ কোটি পরাধীন মানুষ যাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে, চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ লাঘবের ভার যাঁর হাতে, যিনি বাঁচলে চল্লিশ কোটি বাঁচবে, যাঁর মৃত্যুতে চল্লিশ কোটি মরবে—তাঁর চিকিৎসার ভার সেই চল্লিশ কোটি নরনারী আমার উপর দিয়েছে, আপনি 'না' বললেই বা আমি শুনবো কেন?

গান্ধিজী বললেন—কিন্তু ডাক্তার বিধান, তোমার এলোপ্যাথিক চিকিৎসা তো আমি নিতে পারি না।

বিধানচন্দ্র বললেন—মহাত্মাজী, আপনি তো বলেন যে পৃথিবীর সব কিছু, এমন কি ধূলিকণাটি পর্যন্ত ভগবানের সৃষ্টি। এ কথাটা কি সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন?

মহাত্মাজী বললেন—নিশ্চয় নিশ্চয়, সমস্তই ভগবানের সৃষ্টি।

—তাহলে মহাত্মাজী, এলোপ্যাথিক চিকিৎসাটাও কি তাঁর সৃষ্টি নয়?

গান্ধিজী এবার হেসে ফেললেন, বললেন—তোমার উকিল কি ব্যারিষ্টার হওয়া উচিত ছিল, তুমি কেন যে আইনজীবি হওনি আমি তাই ভাবছি।

—ভগবান আমাকে আইনজীবি না করে চিকিৎসাজীবি করেছেন কারণ

তিনি জানতেন যে এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁর সব-সেরা ভক্ত মোহিনদাস করমচাঁদ গান্ধীর চিকিৎসার ভার পড়বে আমার উপর।

মহাত্মাজী হেসে বললেন—তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, তুমি কি ওষুধ দেবে দাও খাই।

এলোপ্যাথিক মতেই এবার গান্ধিজীর চিকিৎসা হোল এবং ক'দিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হলেন।

একদিন সকালে খবরের-কাগজে গান্ধিজী দেখলেন—তাঁকে আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী রাখার জন্য সরকারের অতিরিক্ত সাড়ে পাঁচশো টাকা খরচ হচ্ছে। গান্ধিজী তখনই প্রতিবাদ করলেন, বললেন—আমাকে সাধারণ জেলখানায় রাখা হোক, কোন অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না।

গবর্মেণ্ট সে চিঠির কোন উত্তর দিল না। দিন পনেরো পরে জেলখানার ইনস্‌পেক্টার-জেনারেল একদিন সকালে গান্ধিজীকে এসে বললেন—আপনার শরীরগতিক কেমন? ট্রেণে বা মোটার গাড়ীতে শ'খানেক মাইল যেতে পারবেন?

গান্ধিজী বুঝলেন তাঁকে অন্য কোন জেলখানায় বন্দী করা হবে কিন্তু ইনসপেক্টার-জেনারেল সে সব কথা কিছুই বললেন না। সারাটি দিন গান্ধিজীর মনে সেই কথাটাই তোলা-পাড়া হোল কিনা কে জানে। বিকালে ইনস্‌পেক্টার-জেনারেল এসে বললেন—মহাত্মাজী, কাল সকাল আটটার সময় আপনি বিনা সর্তে মুক্তি পাবেন।

গান্ধিজী বললেন—আপনি কি ঠাট্টা করছেন?

—না। হুকুম এসে গেছে।

মুক্তি অপ্রত্যাশিত। গান্ধিজী বারেক কি যেন ভাবলেন, তারপর লঘুকণ্ঠে বললেন—আমার গাড়ীভাড়ার কি হবে?

—চলে যাবার সময় নিশ্চয়ই আপনি গাড়ীভাড়া পাবেন।

ইনস্‌পেক্টার-জেনারেল চলে গেলেন, গান্ধিজী গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। প্যারিলাল পাশেই বসেছিলেন, সহসা কোন এক সময় গান্ধিজী তাঁকে প্রশ্ন করলেন—আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলেই কি এরা আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে ?

তারপর নিজেই তার উত্তর দিলেন—যাক্, যে জন্যই ছাড়ুক, ওরা যা বলছে তাই সহজভাবে গ্রহণ করা ভালো। তোমরা আটটার আগেই তৈরী থেকো, আটটার পরে তোমাদের আর এক মিনিটও সময় দোব না।

সারা রাত জিনিষপত্র বাঁধতেই কেটে গেল। গান্ধিজী চুপ করে বিছানায় পড়ে রইলেন। চোখে ঘুম নেই। সাত বছর বন্দী থাকার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে ছিলেন কিন্তু ঠিক একুশ মাস পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। যত রাজ্যের চিন্তা ভীড় করে এলো তাঁর মাথায়—চল্লিশ কোটি নরনারীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের দুর্ভাবনা।

বিনিদ্র রাত্রি কেটে গেল। দিনের আলো পূর্ব গগনে ফুটে ওঠার আগেই সকলে স্নান শেষ করে প্রার্থনায় সমবেত হলেন।

প্রার্থনাশেষে গান্ধিজী একখানি চিঠি লিখলেন গবর্মেণ্টের কাছে, কস্তুরবা' ও মহাদেব দেশাইয়ের দাহস্থানটি পবিত্র স্থান হিসাবে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার জন্য।

সাতটার সময় গান্ধিজী এসে দাঁড়ালেন সমাধিস্থানে, কস্তুরবা' ও মহাদেব দেশাইয়ের সমাধিভূমিতে শেষ পুষ্পার্ঘ তুলে দিলেন। আর তিন মাস আগে মুক্তি পেলে কস্তুরবা'কে সঙ্গে নিয়েই তিনি ফিরতে পারতেন। কিন্তু আজ তিনি একান্ত একা।

পৌনে আটটার সময় ইনস্‌পেক্টার-জেনারেল মোটার নিয়ে এলেন, ঠিক আটটার সময় প্রাসাদবেষ্টিত কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে গান্ধিজীর গাড়ী ছুটলো।

পর্ণকুঠির দিকে। গান্ধিজী চুপ করে বসেছিলেন। কোন এক সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বলে উঠলেন—এর চেয়ে মহত্তর মৃত্যু আর হয় না, বা' ও মহাদেব স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁরা অমর হয়ে রইলেন। কারাগারের বাইরে মরলে এ গৌরব কি তাঁরা পেতেন?

পাশে ছিলেন প্যারিলাল ও ডাক্তার সুশীল নায়ার, তাঁরা চুপ করে রইলেন। সঙ্গীহীন দেশনায়কের বেদনা কোথায় তা তাঁরা উপলব্ধি করলেন।

গাড়ী এসে থামলো পর্ণকুঠিতে, চারিপাশে ভীড় জমে গেল, জনতা চিৎকার করে উঠলো—মহাত্মা গান্ধী কি জয়।

পঁচাত্তর বৎসরের অসুস্থ বৃদ্ধ মৃদু হেসে জনতাকে অভিবাদন করলেন। জনতা জানলো না সেই হাসির পিছনে শোকের কি গভীরতা লুকানো আছে।

———

পরিশিষ্ট—

এ' দেশের জেলখানা সম্পর্কে—

সমাজ-জীবনে কারাগারের সৃষ্টি অপরিহার্য। মানুষ যেদিন থেকে সমাজে বাস করতে আরম্ভ করেছে সেইদিন থেকেই যারা শান্তিময় জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় তাদের দমন করার জন্য কারাগার সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছে,— তাদেরকে আটকে না রাখলে তারা আর পাঁচজনের সুখ-শান্তি নষ্ট করে সমাজ-জীবনকে বিশৃঙ্খলায় ভরিয়ে তুলবে এই ভয়ে। বহুজনের কল্যাণের জন্য অপকারীকে দূরে রাখাই কারাগার-সৃষ্টির গোড়ার কথা হলেও অনেক রাষ্ট্রনায়ক শাসনের নামে যে সব অনাচার. অত্যাচার চালাতে চায়, যে তার প্রতিবাদ করে, তার মুখ বন্ধ করার জন্য তাকে কারাগারে ভর্তি করে। আসলে তখন সমাজের কল্যান-কামীরাই যায় কারাগারে। সব দেশের ইতিহাসেই এমন ঘটনা বার বার ঘটেছে। অত্যাচারী কংসের অত্যাচার যিনি প্রতিরোধ করতে পারবেন এমন মানুষ জন্মগ্রহণ করতে পারেন ভেবে বসুদেব ও দেবকীকে কংস কারাগারে রেখেছিলেন। নন্দরাজাদের অনাচার নত মস্তকে মেনে নিতে পারেননি বলে কাত্যায়নকে দীর্ঘদিন কারাগারে কাটাতে হয়েছিল। প্রিয়দর্শী অশোকের হত্যালীলার প্রতিবাদ করেছিলেন বলে সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে 'নরকের' ভয়াবহ কারাগারে নিক্ষেপ করতে অশোক দ্বিধা করেননি। এ শুধু আমাদের দেশেই নয়, গ্রীক রাষ্ট্রনায়কেরা দার্শনিক সক্রেটিসকে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন, সেখানে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। যীশুর কতজন সত্যাগ্রহী অনুচরকে কতকাল কিভাবে রোমানদের কারাগারে কাটাতে হয়েছিল, তার বিবরণ জানা যায় না। শত শত বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অত্যাচারী শাসকের এই নীতি অব্যহত গতিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দাগ কেটে চলেছে।

বংশ শতাব্দীতেও ইংরাজ শাসকদের ভারতশাসনের ইতিহাসে তার ব্যতিক্রম হয়নি, সত্যাগ্রহী কংগ্রেস-নেতাদের কারাবরণই তার সাক্ষ্য।

তবে সভ্যতার ক্রমঃবিবর্তন সেদিনকার কারাজীবনকে কিছুটা উন্নত করেছে। আজকের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে কারাগার শুধু অপরাধীদের অপরাধ করার শক্তিকে খর্ব করে সীমাবদ্ধ রাখার জন্যই নয়, কারাগার অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য। আজকের বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে অপরাধ-প্রবণতা এক প্রকার মানসিক ব্যাধি এবং সেই ব্যাধির ঠিকমত মানসিক চিকিৎসা করতে পারলে, অপরাধীর মনকে রীতিমত শুধ্‌রে দেওয়া যায়, যার ফলে সে আর অপরাধ করতে চায় না। শুধু জেল খাটবার ভয় দেখিয়ে যা হয় না, এতে তার চেয়ে অনেক বেশী ফল হয়। অনেক দেশের কারাগার আজ এই নীতিতে পরিচালনা করার চেষ্টা চলছে, তার মধ্যে রুশ দেশই সবচেয়ে অগ্রগামী। (এই কারাকাহিনীগুলি পড়ার পর রুশিয়ার কারাজীবন তুলনা করে পড়লেই সে কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে বলেই এই বইয়ের শেষে আমি সে বিবরণীটুকু জুড়ে দিয়েছি।) আমাদের দেশের কারানীতিও সেই আদর্শে পরিচালিত হওয়া উচিত। গান্ধিজীর লক্ষ্য ছিল সত্যিকারের মানুষ গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের আদর্শও তাই, কারানীতির সংস্কার সাধনও সেই আদর্শকে সফল করার এক অন্যতম পন্থা।

ভারতের কারাজীবন আগে ছিল শিক্ষিত জনগণের অগোচরে। প্রথম তা'তে আলোক-সম্পাত করেন রাজনৈতিক বন্দীরা—আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের কাহিনী থেকেই আমরা প্রথম কারাজীবনের অভ্যন্তরীণ কঠোরতার কথা জানতে পারি। তারপর অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধিজী, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, পণ্ডিত জহরলাল থেকে সুরু করে শত শত ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা কারাবরণ করতে সুরু করে, তখন এমন অনেক অনাচারের তথ্য প্রকাশ পায় যা অসহণীয়। এই অসহণীয় ব্যবস্থাগুলির প্রতিবিধান করার জন্য মৃত্যুঞ্জয়ী

যতীন দাস অনশনে দেহত্যাগ করেন। তখন ক্ষুব্ধ জনমতকে সাময়িকভাবে শান্ত করার জন্য বিদেশী সরকার কারা-সংস্কার করার উদ্দেশ্যে এক কমিটি বসান। স্যার লুই স্টুয়ার্ট, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ, হাফিজ হিদায়ৎ হুসেন—এই তিনজন ছিলেন সেই কমিটির সদস্য, তাঁরা যা কিছু বলেন, সরকার সেদিকে বিশেষ কিছুই করেন না। কিন্তু শুধু কথার চাতুরী দিয়ে জনমতকে চিরদিন ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তাই যখনই জেলের মধ্যে কোন অনাচারের খবর পেয়ে জনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, তখনই গবর্মেণ্টকে নিজের দোষ ঢাকবার জন্য কিছুটা—তা সে যত সামান্যই হোক—নতি স্বীকার করতে হয়েছে, তার ফলে বোমার মামলার আসামীদের যতটা দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে, ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের আসামীদের ততটা কষ্ট পেতে হয়নি। তাহলেও জেলখানার দুর্গতি তাঁদেরও কিছু কম ছিল না!

কিন্তু বিদেশী শাসন আজ আর নেই। গত দু' বছর ধরে আমাদের কারা-নীতি তাঁরাই পরিচালনা করছেন, যাঁরা একদিন কারাজীবনের শত লাঞ্ছনাকে নিরুপায় হয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মনুষ্যত্বের যে অবমাননা তাঁরা বার বার প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাঁদেরই কর্তৃত্বাধীনে সেই নীতির যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, সে-ব্যবস্থা তাঁদের আজ করতে হবে,—বিপ্লবীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ক্ষিপ্রহস্তে দ্রুত পরিবর্তনের গতি প্রবর্তন করাই বাঞ্ছনীয়, অর্থাভাবের অজুহাতে সময়-ক্ষেপ পরিহার করাই কর্তব্য। আজকের রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে দেশবাসী যে অনেক-কিছুই প্রত্যাশা করে!

কারাজীবনের যে দুর্নীতিগুলি দেশ-নায়কদের চোখে একদিন পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছিল সেইগুলির প্রতিবিধান করাই আজ সর্বপ্রথম কর্তব্য।

প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হবে পরিচ্ছন্নতার দিকে। যে যে-অপরাধই করুক না কেন, তার নিয়মিত স্নান করার ব্যবস্থা রাখতে হবে, জামা কাপড় সাফ রাখার জন্য জল, সাবান, উপযুক্ত অবসর যেন সে পায়।

জেলের আহার্যাদি পর্যাপ্ত ও সুপাচ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুষ্পাচ্য ও নিকৃষ্ট খাদ্য খেতে খেতে অনেক সময় কয়েদীরা রোগাক্রান্ত হয়, রীতিমত পরিশ্রম করতে পারে না, তাতে জেলের ব্যয় বৃদ্ধি হয়।

যে সব কয়েদীরা ধূমপানে অভ্যস্ত তাদের প্রতিদিন পরিমিত ভাবে তামাক বা বিড়ি সরবরাহ করাই বিধেয়। তামাক ও বিড়ি পাতার জন্য কয়েদীদের মধ্যে নানা দুর্নীতি দেখা দেয়। সে দুর্নীতি দমন করার জন্য এই প্রকৃষ্ট পন্থা।

ঘানি-টানা, পাথর-ভাঙা, জল-তোলা, ছোবড়া-পেটানো প্রভৃতি কাজ যতটা সম্ভব বৈদ্যুতিক কলকব্‌জা দিয়ে করানোই ভালো, তাতে কয়েদীরা এখন কায়িক পরিশ্রম করে যে পরিমানে জিনিষ উৎপাদন করছে, তার বহুগুন বেশী উৎপাদন করবে, সেই উৎপন্ন বস্তু গবর্মেণ্ট বাজারে বিক্রী করে অর্থ পাবেন, তা থেকে জেলখানার ব্যয় নির্বাহ করেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকার সম্ভাবনা আছে। জেল তখন আর সরকারের একটা ব্যয়-বহুল প্রতিষ্ঠান থাকবে না, হবে একটা রীতিমত আয়ের পথ।

কয়েদীদের বাসস্থানের উন্নতিবিধান করতে হবে। কয়েদী যেন মনে না করে যে গবর্মেণ্ট তাকে জব্দ করার জন্য এত কষ্ট দিচ্ছে। ঘরের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা রহিত করতে হবে, গ্রীষ্মকালে তারা হাত-পাখা ব্যবহার করতে পারবে, শীতকালে পাবে উপযুক্ত শীতবস্ত্র।

প্রত্যেক কয়েদীর খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকবে—হাডু-ডু-ডু, বাস্কেট বল, গুলি ডাণ্ডা বা এই ধরণের কোন খেলা। দিনের মধ্যে একটা অবসর-সময় তারা খেলবে।

কয়েদীরা সপ্তাহে একদিন ছুটী উপভোগ করবে। পূজা ও উৎসবের দিনে তারা সরকারী কর্মচারীদের মত ছুটী পাবে।

মাঝে মাঝে ছুটীর দিনে তাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

যারা নিরক্ষর তাদের জন্য লেখাপড়া শেখার রীতিমত বন্দোবস্ত থাকবে।

আর যারা লেখাপড়া জানে, তাদের খবরের-কাগজ, মাসিক পত্রিকা ও বই পড়তে দেওয়া হবে। জেলের মধ্যে সেজন্য একটি করে পাঠাগার থাকবে, লেখার কাগজ কলমও তারা পাবে। প্রত্যেক কয়েদীকে তার দৈহিক শক্তি ও মানসিক রুচি অনুযায়ী এমন কোন হাতের কাজ শেখার সুযোগ দিতে হবে, যাতে সে মুক্তি পাবার পর সেই কাজ করে সৎভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারে। যখন আত্মীয়-বন্ধুরা দেখা করতে আসবে, তখন যেন তারা স্বচ্ছন্দে ঘরোয়া কথা আলোচনা করতে পারে সেইমত অবসর ও পরিবেশের ব্যবস্থা থাকবে প্রত্যেক কারাগারে।

কয়েদী সত্যিই কিছু মানসিক উন্নতি লাভ করছে কি না তার পরীক্ষা হবে শ্রেণী বিভাগ করে। নতুন কয়েদী প্রথমে আসবে 'সি' শ্রেণীতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি তার আচরণে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন তখন তাঁকে 'বি' শ্রেণীতে উন্নীত করবেন, তারপর সেখান থেকে সে উন্নীত হবে 'এ' শ্রেণীতে। যতই উন্নীত হবে সুযোগ সুবিধা ততই সে বেশী পাবে। তার ফলে প্রত্যেক কয়েদীরই আত্মোন্নতির একটা প্রচেষ্টা থাকবে।

কয়েদীরা অনেক সময় যখন জেল থেকে বাহির হয়, তখন তারা একেবারে নিঃস্ব, সুবিধামত কোন কাজ-কর্ম না পেয়ে শেষে পেটের জ্বালায় সে আবার অপরাধ অপরাধ' করে ধরা পড়ে। হয়তো সুযোগ-সুবিধা পেলে সে আর অপরাধ করতো না, কিন্তু বেচারা নিরুপায়। এর প্রতিবিধান করার জন্য প্রত্যেক কয়েদীর কাজের অনুপাতে বেতনের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। সেই বেতনের টাকাটা টাকাটা মাসে মাসে কর্তৃপক্ষের হাতে জমা হবে, ছাড়া পাবার সময় সেই টাকাটা সে একসঙ্গে হাতে পাবে, তাতে অন্ততঃ কিছুদিন তার চলবে। ইতিমধ্যে সে সে একসঙ্গে হাতে পাবে, তাতে অন্ততঃ কিছুদিন তার চলবে। ইতিমধ্যে সে নিজের অন্নসংস্থানের জন্য একটা কোন পন্থা খুঁজে নিতে পারবে।

কারা-নীতির এই সব সংস্কার করতে হলে সবার আগে চাই, উচ্চশিক্ষিত কর্মচারী। কর্মচারীদের বেতন কম, সেইজন্য যোগ্য লোক ও-কাজে যায় না।

বেতনের মান কর্মচারীদের জীবনধারন ও সংসার প্রতিপালনের উপযোগী করতে হবে, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছেলেরাও ও-চাকরী গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না। পুরাতন কর্মচারীদের বিদায় দিয়ে নূতন যুবকদল নিয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জেলের পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষিত তরুণেরা কয়েদীদের অহেতুক গালি দেবে না, অকারণে ক্ষিপ্ত হয়ে মারপিটও চালাবে না। অমানুষকে তারা মানুষ করার কাজে লাগবে। তাদের উদ্দেশ্য হবে স্বাধীন দেশের বিপথ-গামী নাগরিকের মন থেকে দুর্নীতির আকাঙ্খাকে নিঃশেষে মুছে দেওয়া। সৎকাজের জন্য এদেশে কখনও সজ্জনের অভাব হয়নি, আজও হবে না।

সবার শেষ কথা হচ্ছে যে, সহরের মাঝে জেলখানা না রাখাই ভালো। সহর থেকে দূরে প্রশস্ত স্থানে কারা-নগরী গড়ে তুলতে হবে। সেখানে প্রথমে হয়তো গবর্মেণ্টের কিছু ব্যয় হবে সত্য কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অমানুষরা যখন সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে, তখন সাফল্যের তুলনায় সেই ব্যয় নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে। তাছাড়া কারাগারে উৎপন্ন দ্রব্য থেকে পরে সরকার প্রচুর লাভও করতে পারবেন।

কারানীতির সংশোধনের ব্যাপারে আমরা সোভিয়েট কারাগারকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। যে জাতির কাছে যেটুকু ভালো পাব, তাই আত্মসাৎ করে আজ আমাদের অগ্রগামী হতে হবে। পুরাকালে বৌদ্ধ নীতি গ্রহণ করে তিব্বত, চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ সংস্কৃতিতে বর্ধিষ্ণু হয়েছিল, আজকের মানুষ সেযুগের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত, প্রতিটি জাতি আজ একই মানব গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত বলে ভাবতে শিখেছে, কাজেই যার যেটুকু ভালো তা অপরে গ্রহণ না করলে জাতিতে জাতিতে একাত্মবোধ ঘনিষ্ঠতর হবে না এবং যে সবার পিছনে পড়ে থাকবে, অগ্রগামীর শোষন ও পীড়ন অনিবার্য ভাবে তাকে পৌঁছে দেবে আত্মবিলুপ্তির দিকে।

সোভিয়েট রুশিয়ার জেলখানা

আজকের দিনে কারা-সংস্কারের কোন কথা উঠলেই, স্বতঃই সোভিয়েটের কারা-ব্যবস্থার কথা মনে ওঠে। বিপ্লব-উত্তর রুশিয়া তার জেলখানাগুলিকে যে রূপ দিয়াছে, তা চোখে না দেখলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না। পরিকল্পনা ও আদর্শের কোন মূল্য নেই, যতক্ষণ না তা বাস্তবের রূপ নিচ্ছে। 'কি করবো,' তার চেয়ে 'কি করেছি'—তার মর্যাদা অনেক বেশী।

সেভিয়েট রুশিয়া তিন দিক থেকে অপরাধীর বিচার করেঃ দমনমূলক, চিকিৎসামূলক ও শিক্ষামূলক। চৌদ্দ বছরের কম বয়স্ক কোন ছেলে অপরাধ করলে তাকে সাজা না দিয়ে চিকিৎসক ও শিক্ষানীতিজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দশ বছরের বেশী কাউকে কারাদণ্ডিত করা হয় না। রাজনৈতিক অপরাধ ও দেশের শত্রুতাচরণ না করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না।

১৯২৭ সালে সোভিয়েটের দশম বার্ষিক উৎসবে পণ্ডিত জহরলাল রুশিয়া যান, তিনি সেখানে মস্কো শহরে একটি কারাগার দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর 'সোভিয়েট রাশিয়া' পুস্তকে তিনি সে সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী চিন্তানায়কের সে বৃত্তান্ত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। পণ্ডিতজী লিখেছেনঃ

"বাড়ীটী ত্রিতল। বারান্দার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি করিয়া প্রকোষ্ঠ। ঘরগুলি বিশেষ ক্ষুদ্র নয়। প্রত্যেক ঘরে দুই তিনখানা করিয়া খাটিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক কামরায় কতকগুলি করিয়া পুস্তক রহিয়াছে। দুইটি কামরাতে

বেতারযন্ত্রের সরঞ্জামও দেখিতে পাইলাম। শুনিলাম উহা কয়েদীরা নিজেরাই স্থাপন করিয়াছে।

"এই কারাগারে সর্বশুদ্ধ সাড়ে চারিশতের উপর কয়েদী ছিল। প্রত্যেকেই কোন-না কোন গুরুতর অপরাধের জন্য দীর্ঘকালের কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত। তবে দশ বৎসরের অধিক কালের জন্য কেহই কারারুদ্ধ নহে। আর এই দশ বৎসরও সম্পূর্ণভাবে কাহাকেও কারাগারে থাকিতে হয় না কারণ উত্তমরূপে কার্য করিলে ও কোনরূপ খারাপ ব্যবহার না করিলে সকলেরই দুই তিন বৎসর করিয়া কম করিয়া দেওয়া হয়। এই কারাগারের কর্মচারীসংখ্যা কারাধ্যক্ষ, অস্ত্রচিকিৎসক ও তাঁহার সহকারীবৃন্দ লইয়া প্রায় বাহান্ন-তিপ্পান্ন জন হইবে। ইহারা তিনটি দলে বিভক্ত হইয়া পর্যায়ক্রমে কাজ করেন। সুতরাং এক দলকে দিনে আট ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে হয় না। এখানকার একটা বিশেষত্ব দেখিলাম যে এখানে দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদিগের মধ্য হইতে প্রহরী নির্বাচনের ব্যবস্থা নাই। শুনিলাম এখানকার কর্তৃপক্ষ কতিপয় কয়েদীকে অপর কয়েদীদিগের প্রহরী নিযুক্ত করিবার প্রথাকে অতি দূষণীয় মনে করেন। আমরা আরও লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে এখানকার প্রহরীদিগের হস্তে কোনরূপ অস্ত্র কিম্বা একখানা লাঠি পর্যন্ত ছিল না।....

"আমরা দেখিলাম এখানে কয়েদীদিগের গাত্রে কোনরূপ নির্দেশক সংখ্যা নাই, কিম্বা কোনরূপ পৃথক পোষাকও নাই ;....দেখিলাম এই কারাপ্রাঙ্গণে কয়েদীদিগের নানারূপ ক্রীড়া করিবারও ব্যবস্থা আছে।

"আমরা কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শৃঙ্খল ও হাতকড়ি ব্যবহার করা হয় কি না। তাহাতে তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, যে ও সমস্ত জিনিষ 'ভদ্রলোকের' দেশেই ব্যবহৃত হয়, তাঁহাদের দেশে ঐ সমস্ত জিনিষ যাদুঘরে রক্ষিত হয়।....

"কয়েদী শ্রমিকগণের পক্ষেও যথাসম্ভব ট্রেড-ইউনিয়নের নিয়মাবলী প্রয়োগ

করা হইত।....কারাগারের বাহিরে ট্রেড-ইউনিয়নের নিয়ম অনুসারে শ্রমিকদিগকে যেরূপ বেতন দেওয়া হইত ইহাদের তদনুপাতে শতকরা ৩০ টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইত। কয়েদীদিগের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ সঞ্চিত হইত, ওই সঞ্চিত অর্থ কোনরূপ ব্যয় করিতে দেওয়া হইত না। জেল হইতে খালাস হইবার সময় ঐ সঞ্চিত অর্থ এবং অন্য কিছু প্রাপ্য থাকিলে তাহা,—এই সমস্ত দেওয়া হইত। সুতরাং কারাগার হইতে বাহির হইয়া তাহারা আমাদের দেশের কয়েদীদের ন্যায় অনন্ত সমুদ্রে পড়ে না, তাহারা ঐ অর্থ লইয়া পুনরায় নূতন করিয়া জীবনের কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। কয়েদীদের আয়ের বাকী এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তাহারা কারাগার-সংলগ্ন দোকান হইতে, কিম্বা সম্ভব হইলে বাহির হইতে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় করিতে পারিত। কারাগারের ভিতরের এই দোকান আমরা দেখিলাম। এই দোকানের তত্ত্বাবধান করিত একজন কয়েদী। দোকানে সিগারেট, খাদ্যসামগ্রী ও বেশ-ভূষার দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। কয়েদীরা পুস্তক খরিদ করিতে পারিত। কয়েদীদের হাতে টাকা দেওয়া হইত না, তবে তাহারা দোকান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া বিল সহি করিয়া দিত এবং পরে কারাগারের কর্তৃপক্ষ ওই বিল পরিশোধ করিতেন। কারাগারের বাহির হইতে বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়স্বজন কয়েদীদিগকে টাকা কিম্বা দ্রব্যাদি পাঠাইতে পারিতেন।

"কয়েদীরা যখন ইচ্ছা ধূমপান করিতে ও পরস্পরের সহিত আলাপ করিতে পারিত। এই জেলের অভ্যন্তরে একটি ক্ষৌরকারের দোকান ছিল।....এখানে কয়েদীরা অল্পব্যয়ে ক্ষৌরকার্য করাইতে পারিত। এই দোকান চালাইত একজন কয়েদী। সে এই দোকানে কাজ করিয়া অর্থ উপার্জন করিত। যে সমস্ত কয়েদী ক্ষৌরকার্য করাইতে যাইত তাহারা নিজেদের আয় হইতে তাহার পারিশ্রমিক দিত। আমরা দাঁড়াইয়া দেখিলাম একজন কয়েদী এই দোকানে

ক্ষৌরকার্য করাইল এবং কার্য শেষ হইলে তাহার গায়ে খানিকটা অ-ডি-কোলন ছিটাইয়া দেওয়া হইল।

"আমরা কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে কোন রাজবন্দী আছে কিনা। তখন আমাকে দুইজন রাজবন্দীর নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট শুনিলাম, সে রুশিয়াতে জেকোশ্লোভাকিয়ার গুপ্তচরের কার্য করিত এবং সেই অপরাধে তাহার দশ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড হইয়াছে। এই লোকটি বেশ সুশিক্ষিত ও সঙ্গীতজ্ঞ। সুতরাং তাহাকে কারাগারের সঙ্গীতের অধ্যক্ষ করা হইয়াছে। আমরা যখন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম সে সঙ্গীতসম্পর্কীয় একটা কি লিখিতেছে। তাহার ঘরে একটী বেতার সরঞ্জামও দেখিলাম; শুনিলাম এটী সে নিজের আয় হইতেই করিয়াছে।....

"দ্বিতীয় রাজবন্দী বলশেভিক সৈন্যদলে একজন বিমানপোতাধ্যক্ষ ছিল।.... সে স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বীয় বিমানপোত লইয়া বিপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছিল, পরে সে ধৃত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবশেষে মৃত্যুদণ্ড রদ করিয়া তাহার দশ বৎসর কারাদণ্ড হয়।....কারাগারের তড়িৎসংক্রান্ত ব্যাপারের তত্বাবধানের ভার ছিল তাহার উপর। এই ব্যক্তির কক্ষেও একটী বেতার সরঞ্জাম ও কতিপয় পুস্তক দেখিলাম।....

"এই কারাগারের অধ্যক্ষ আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, কয়েদীরাও মানুষ, তাহাদের মধ্যেও মনুষ্যোচিত অনেক গুণ বর্তমান। সুতরাং কয়েদীরা যাহাতে কোনরূপে মনে করিতে না পারে যে তাহারা সমাজচ্যুত, তাহারা মনুষ্যত্বহীন, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।....তাঁহাদের কারাপ্রথার উদ্দেশ্য অপরাধীকে পশুতে পরিণত করা নয়, তাহাকে সুসভ্য নাগরিক করিয়া তোলা। তাঁহারা মনে করেন খারাপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শিক্ষা ও বুদ্ধির অভাব, এই সকলেরই ফল

অপরাধ। সুতরাং অপরাধকারীদেরও তাঁহারা প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা দ্বারা চালিত বুদ্ধিভ্রষ্ট জীব অথবা রুগ্ন অশিক্ষিত ও অন্ধ মানব বলিয়া বিবেচনা করেন। এবং তদনুযায়ী....তাঁহাদের উদ্দেশ্য উহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সমাজ-বাসের উপযুক্ত করিয়া তোলা।....

"একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ভারতের কোন কারখানার শ্রমিক-জীবনের চাইতে রুশিয়ার কারাজীবনও অনেকাংশে শ্রেয়।....রুশিয়ার সোভিয়েট গবর্মেণ্ট অন্য যাহা কিছু করিয়াছেন তৎসমুদয় বাদ দিয়া তাঁহারা পূর্বোক্তরূপ যে কয়েকটী কারাগার স্থাপন করিয়াছেন শুধু তাহারই বিষয় যদি আলোচনা করা যায় তাহা হইলে মনে হয় ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট কীর্তি।"

এরই পাঁচ বৎসর পরে খ্যাতনামা মার্কিণ সাংবাদিক মরিস্ হিণ্ডাস্ রুশিয়া ভ্রমণে যান। পণ্ডিতজী যে কারাব্যবস্থা দেখে এসেছিলেন, পাঁচ বছরে তার তখন অনেক উন্নতি হয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'গ্রেট্ অফেন্সিভ্'এ তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন:

"এঁরা জেলখানার নতুন নামকরণ করেছেন সংশোধনাগার—ইস্প্রাভ্ডম্।

"জেলখানায় এসেছি বলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না, কোন দেয়াল নেই, কোন দুর্গও নয়, সঙ্গীনধারী কোন শান্ত্রী চোখে পড়লো না, গরাদ-দেওয়া কোন ফটকও নেই।....প্রথমেই চোখে পড়লো একটা পার্ক, সেখানে লাউড-স্পীকারে বক্তৃতা হচ্ছে, একদল লোক শুনছে, আরেক জায়গায় কয়েকজন দাঁড়িয়ে গল্প করছে। মনে হোল যেন কোন গাঁয়ে এসেছি।..

"এই জেলখানায় নানা ধরণের কয়েদী আছে। কেউ বা পদস্থ সরকারী কর্মচারীর খুনের দায়ে জেলে এসেছে, কেউ বা খুন করেছে, চুরি করেছে কেউ বা। আমরা জেলখানার আপিসে গেলাম, জেলখানা বলে কিন্তু মনে হোল না। টেবিলের উপর বই রয়েছে, খবরের কাগজ রয়েছে, দেয়ালে রয়েছে প্রাচীরপত্র। চারিপাশে কয়েকখানি বাড়ী, পাশে গোয়ালঘর ও

কঠোরতা ও অহেতুক অবমাননার কোন স্থান নেই সোভিয়েট কারাগারে ! কর্তৃপক্ষ যদি শুনতে পান কোন শান্ত্রী কোন কয়েদীরা সঙ্গে কোনরকম দুর্ব্যবহার করেছে, কি গালি দিয়েছে অথবা কোন অপমান করেছে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করবেন এবং তাকে সাজা দেওয়া হবে। কারণ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন—সমাজের প্রতি অপরাধীর কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সমাজের দায়িত্ব আছে অপরাধীকে সংশোধন করার। কারণ বিশেষ উত্তেজক কোন অবস্থায় না পড়লে কোন সাধারণ মানুষ সমাজ-বিরোধী কোন কাজ করতে পারে না। পারিপার্শ্বিকতা অপরাধী সৃষ্টি করে।....সামাজিক অপরাধ একটা আকস্মিক ঘটনা। এই সব অপরাধীদের সঙ্গে যদি সদ্‌ব্যবহার করা যায়, যদি তাদের লেখাপড়া শেখানো যায়, যদি তারা নিয়মিত কাজ করতে ও খেলতে পায় তাহলে তারা ভবিষ্যতে সমাজের সম্পদ্ বলে গণ্য হবে।"

সেইজন্যই অপরাধীদের আত্মসংশোধনের সুযোগ ও সুবিধা দিতে সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কোন কার্পণ্য করেন না।

এই ব্যবস্থাকে যদি আমরা পরীক্ষা-মূলক বলেও মনে করি, তাহলে ফলাফল দেখে একথা নিশ্চয় করে বলা যায় যে এই সুরুচি-সম্মত ব্যবস্থা আশানুরূপ ফলদায়ক হয়েছে এবং মনুষ্যত্ব যোগ্য মর্যাদায় আত্ম-বিকাশ করছে।

যে সব বই থেকে সাহায্য নিয়েছি ঃ

শ্রীঅরবিন্দ লিখিত 'কারাকাহিনী'
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখিত 'দ্বীপান্তরের কথা'
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'জেলে ত্রিশ বছর'
হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিত 'দেশবন্ধু স্মৃতি'
হেমন্তকুমার সরকার লিখিত 'বন্দীর ডায়েরী'
সুভাষচন্দ্র বসু লিখিত 'তরুণের স্বপ্ন'
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী লিখিত 'জেল লাইফ'
বীণা দাস লিখিত 'শৃঙ্খল-ঝঙ্কার'
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু লিখিত 'অটোবায়োগ্রাফি'
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত লিখিত 'রুদ্ধকারার দিনগুলি'
কৃষ্ণা হাতিসিং লিখিত 'কোন খেদ নাই'
সতীশ দাসগুপ্ত অনূদিত গান্ধিজীর 'য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা'
ধীরেন্দ্রলাল ধর লিখিত 'আমাদের গান্ধিজী'
রঘুবীর সহায় লিখিত 'লাইফ ইন এন ইণ্ডিয়ান জেল'
পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু লিখিত 'সোভিয়েট রাশিয়া'
মরিস হিণ্ডাস্ লিখিত 'গ্রেট অফেনসিভ্'
রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'

আস্তাবল। সর্বত্রই ইলেকৃট্রিক আলোয় আলোকিত। গোয়ালঘরটি এতো পরিচ্ছন্ন যে সহসা গোয়াল বলে মনে হয় না। গরু ও শূকরগুলি দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট, খোস মেজাজে তারা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

"মাঠের পাশেই এক সারি বাড়ী। এগুলিতে কয়েদীরা থাকে। জানালাগুলি বড় বড়, দরজা খোলা। এক একখানি ঘরে ছ' জন থেকে বারো জনের শয়নের ব্যবস্থা আছে। বিছানাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,—কম্বল আছে, বালিশ আছে, টেবিল চেয়ার আছে, দেয়ালে বড় বড় বলশেভিক নেতার ছবি টাঙানো আছে, আরসিও আছে এক একখানি করে। এখানকার স্বাচ্ছন্দ্য রুশিয়ার অনেক গ্রামবাসীর চেয়ে বেশী।

"রান্নাঘরে গেলাম, সেখানেও বেশ পরিচ্ছন্নতা—কেৎলি, থালা, বাটি সবই ঝক্‌ঝক্ করছে—ঘরের কোথাও খাবারের টুকরো, আলুর খোসা কি হাড় নেই। কাছাকাছি কোথাও আস্তাকুড় চোখে পড়লো না। রান্নাঘরে কাজ করছিল কয়েকজন মেয়ে-কয়েদী,—তারা তো আমাকে নিমন্ত্রণ করে বসলো,—রুটি ও ঝোল না খাইয়ে ছাড়লো না।

"শুনলাম এখানে ৭২০ জন কয়েদী অছে, তার মধ্যে ১৪০জন রমণী। এদের বাস করার জন্য এখানে পঁচিশখানি বাড়ী আছে, চার হাজার বিঘা (hectar) আবাদী জমি আছে, চাষ করার জন্য তিনটি কলের লাঙল (tructor) আছে, আর আছে সাতশো শূকর ও ২৩০টী গাভী। স্নানের ঘর, চুল-ছাঁটার দোকান ও মুদীখানাও আছে। সংশোধনাগার মানে রীতিমত একখানি সমবায় গ্রাম। ওরা বললো,—গত বছর ওরা ফসল বেচে বিরাশী হাজার রুব্‌ল্ লাভ করেছে।

এখানে কয়েদীরা রীতিমত মাইনে পায়। তিনটি শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা হয়েছে: যারা কিছুই জানে না, যারা কলকব্‌জা চালাতে জানে, আর যারা উন্নত কর্মকুশলী। যে যা মাইনে পায় তার অর্ধেক গবর্মেণ্ট থাকা-

খাওয়ার খরচ বাবদ কেটে নেয়। বাকী অর্ধেক এরা খুসীমত খরচ করে—দরকার-মত কোন জিনিষ কিনলো, কি টাকাটা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। গ্রীষ্মকালে দিনে দশ ঘণ্টা আর শীতকালে দিনে আট ঘণ্টা এদের কাজ করতে হয়, এবং পাঁচ দিন কাজ করার পর এক দিন ছুটি পায়। দিনের কাজ শেষ করে খুসীমত বেড়াবার স্বাধীনতা তাদের আছে—কেউ বা রেডিও শুনছে, কেউ খেলছে, কেউ বা সাঁতার কাটছে। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের জন্য তখন ইস্কুল বসে। যারা গানবাজনা অভিনয় করতে ভালবাসে, তারা তখন যাবে ড্রামাটিক ক্লাবে অথবা অর্কেষ্ট্রা পার্টিতে। সপ্তাহে এক দিন করে সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থাও আছে। সাপ্তাহিক ছুটীর দিনে কেউ কেউ সহরে চলে যায়, সারাটা দিন সেখানে কাটিয়ে রাত্রে ফিরে আসে। সারা বছর ভালোভাবে থাকলে কয়েদীরা সাত দিন থেকে এক মাস পর্যন্ত ছুটী পেতে পারে। বাহিরে কোথাও গেলে তাদেরকে থানায় গিয়ে দেখা করতে হয় না। কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে ছুটীর অবসরটুকু বাইরে কাটিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তারা ঠিক ফিরে আসবে। যদি দৈবাৎ যথাসময় কেউ না ফেরে, তখন তাকে সন্ধান করে ধরে আনা মোটেই কঠিন কথা নয়। কিন্তু সেজন্য তাকে বিশেষ কোন সাজা দেওয়া হয় না, শুধু কিছুদিনের মত ছুটী বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দোকান থেকে কোন জিনিষ কেনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

"যদি কোন কয়েদী বিবাহিত হয়, তার স্ত্রী ছুটীর দিনে স্বামীর কাছে এসে সারাটা দিন কাটিয়ে যেতে পারে। কয়েদীরা ইচ্ছা করলে জেলে অবস্থান কালে মনোমত পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ করতে পারে, কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দেওয়া দূরে থাক্, শুভেচ্ছা জানাবে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মনে করেন—'কয়েদীর জীবন যত স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে, কয়েদী ততই শৃঙ্খলা মেনে চলবে এবং যাতে তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন কাজ সে সহজে করতে চাইবে না।' সেই জন্য প্রতিশোধমূলক শাস্তি, নির্মম অত্যাচার, অনাবশ্যক